প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন, ১৩৭৯
ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮

বা/এ ১৫৩৯

মুদ্রণ সংখ্যা : ৫০০ কপি

পাণ্ডুলিপি : ফোকলোর উপ-বিভাগ

প্রকাশক
শামসুজ্জামান খান
পরিচালক
গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর
আবু আহমদ ভুইয়া
প্যারাডাইস প্রিন্টিং প্রেস
৬৪, বেচারাম দেউড়ী ঢাকা-১

ভূমিকা

কিংবদন্তী হলো তাই যা ইতিহাস ও কল্পনার সংমিশ্রণে লৌকিক কথা সাহিত্যের রূপ নেয়। একে ঐতিহাসিক কথা সাহিত্য বলা যায় না, কেননা ইতিহাস যে জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারে না, কিংবদন্তী কল্পনার ভিয়ান চড়িয়ে তার উত্তর দিয়ে থাকে। একে নিছক কল্প-কাহিনী বলা যায় না, যেহেতু এর ভিত্তি হচ্ছে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও স্মৃতি বিজড়িত স্থান। তাই কিংবদন্তীর মূল কেন্দ্রভূমি বলতে যে সব স্মৃতি বিজড়িত স্থান ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে বুঝায়, তারা রেশম সৃষ্টিতে গুটিপোকা যে ভূমিকা পালন করে, সেই একই ভূমিকা পালন করে থাকে। পুরাণের মতো এর উৎস সন্ধানের প্রয়াস থাকলেও তার সঙ্গে এর পার্থক্য রয়েছে। পুরাণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুভূতি সক্রিয়, কিন্তু কিংবদন্তী একান্তভাবেই লৌকিক। কিংবদন্তী কোন প্রামাণ্য-দলিল বা ইতিবৃত্ত নয়; নয় কোন নীতিকথা বা যুক্তিসিদ্ধ কাহিনী। অলৌকিক ঘটনাবলী এর উপজীব্য। প্রাকৃত মানুষের মুখে মুখে পুরুষানুক্রমে এর চলমান স্থিতি। বিশ্বাসকে সম্বল করেই এর টিকে থাকা।

লোকঐতিহ্যের একটি প্রধান শাখা কথা সাহিত্যে কিংবদন্তী উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, ইতিহাসের সূত্রগুলো এখনো প্রাকৃত মানুষেরাই সযত্নে সংরক্ষণ করে আসছে। অলৌকিকতায় আচ্ছন্ন হলেও ব্যক্তি বা স্থানের ঐতিহাসিক মূল্য বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি। এই কারণেই বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুর কিংবদন্তী সংগ্রহ করেছে। লোকসাহিত্য দশম খণ্ডে এর প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান খণ্ডে এর দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হলো। লৌকিক কথা সাহিত্যের এই শাখার প্রতি সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এই জাতীয় অলৌকিকতায় আকীর্ণ কাহিনীর ভেতর থেকে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের প্রয়োজনে প্রচুর ঐতিহাসিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

মোমেন চৌধুরী

সূচীপত্র

কুমিল্লা

কুমিল্লা জেলা থেকে বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক
জনাব মোহাম্মদ মোর্তজা আলী 'নাডের দীঘির'
কিংবদন্তীটি সংগ্রহ করেছেন। তাঁর ঠিকানা—
গ্রাম—ইলিয়াসপুর, ডাকঘর—ভুবনঘর,
জেলা—কুমিল্লা।

নাডের দীঘির কিংবদন্তী

কুমিল্লা জিলার হাজীগঞ্জ থানার হাজীগঞ্জ শহরের নিকটে এক প্রকাণ্ড দীঘি আছে। ইহাকে লোকে "নাডের দীঘি" বলে।

একটা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া দীঘিটি বিরাজমান। দীঘিটির চারিটি পাড় অদ্যাবধি অভগ্ন অবস্থায় বিদ্যমান। দীঘিটি দর্শকদের একটি দর্শনীয় বস্তু। নাডের দীঘিটি সম্বন্ধে একটি চমৎকার কিংবদন্তী আছে। তবে বক্ষ্যমান কিংবদন্তীটি কিছুটা ইতিহাসমূলক। নিম্নে কিংবদন্তীটির বিবরণী দেওয়া হইল।

মহামান্য মোগল সম্রাট শাহজাহানের অন্তিম মুহূর্তে দিল্লীর সিংহাসন লইয়া তাঁহার পুত্র দারা, শুজা, ঔরঙ্গজেব ও মুরাদের মধ্যে বিষম কলহ উপস্থিত হইল। পিতৃসিংহাসনের নিমিত্ত প্রত্যেক ভাইই দাবী জানাইলেন। মোগল সাম্রাজ্যের তখন এক ঘোর দুর্দিন। সিংহাসন লাভের দুর্বার মোহে শুজা, ঔরঙ্গজেব ও মুরাদ প্রত্যেকেই স্ব-স্ব সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু ঔরঙ্গজেব আপন বীরত্ব ও বিচক্ষণতার গুণে সকল ভাইকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন নিষ্কণ্টক করেন। সম্রাট শাহজাহান আপন ছেলে ঔরঙ্গজেব কর্তৃক বন্দী হন।

এইদিকে শুজা ঔরঙ্গজেবের নিকট পরাস্ত হইয়া প্রাণের ভয়ে পূর্ব দিকে পলায়ন করেন।

তারপর তিনি আরাকান রাজ্যে গমন করেন। কথিত আছে যে আরাকান যাওয়ার পথে শুজা সপরিবারে হাজীগঞ্জে কিছুদিন অপেক্ষা করেন।

হাজীগঞ্জে অবস্থান কালে বাদশাহ শুজা মনে করিলেন যে, হাজীগঞ্জে তিনি একটি স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া যাইবেন। এই মর্মে তিনি মনে করিলেন যে একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনন করিবেন।

যেই চিন্তা সেই কাজ। বাদশার আদেশক্রমে দীঘি খনন করার কাজ আরম্ভ হইয়া গেল। হাজার হাজার লোক দীঘির কাজে লাগিয়া গেল।

মাটিয়ালের গমগমিতে সেই দিন হাজীগঞ্জের আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া গিয়াছিল।

এইভাবে একমাস একদিন খননের পর দীঘি হাজীগঞ্জের চেহারা পরিবর্তন করিয়া দিল। বাদশাহ্ শুজার মনের সাধ কিছুটা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এখন উক্ত শুষ্ক জলাশয়টিকে জল-পরিপূর্ণ অবস্থায় দেখিলেই বাদশাহ্র মনের আকাংখা পরিপূর্ণ হইবে। বাদশাহ্র আজ দুঃসময়। আপন প্রাপ্য জিনিস থেকে তিনি সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত হইলেন। বাদশাহ্র মনের ভিতরে আজ শুধু ক্ষোভ আর দুঃখ। তিনি যদি আজ আপন জলাশয়টিকে অন্যান্য সরোবরের মত কুমুদ-কহ্লার বিকশিত অবস্থায় দেখিতে পারিতেন, সরোবর হইতে উত্থিত বাতাসের মধুর শীতল ছোঁয়াচ যদি তাহার দগ্ধীভূত অঙ্গে ক্ষণিকের তরে কিঞ্চিত আনন্দ শিহরণ জাগাইয়া দিত, তবে বাদশাহ্র সন্তপ্ত হৃদয়ের মর্মদাহ অন্ততঃ কিছুটা নিবারিত হইত। বাদশাহ্ আজ এই চিন্তায় মগ্ন।

কিন্তু এহেন দীঘিতে পানি উঠিতেছে না। বাদশাহ্ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বাদশাহ্ ও তাহার পরিবারের সকলে ইচ্ছাময়ের কাছে তাহাদের আকুল আবেদন পৌঁছাইয়া দিলেন। কিন্তু ভাগ্য বিতাড়িত শুজার আকুল আহ্বানে আল্লাহ্ কোন সাড়া দিলেন না।

এখন বাদশাহ্র মনে চিন্তার উদ্ভব হইল। বাদশাহ্ মনে করিলেন যে বিপদ যখন আসে তখন উহা কখনও একাকী আসে না। তাই তাহার সাধের দীঘিতে জল উঠিতেছে না। বাদশাহ্ দিনের পর দিন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দীঘির বিশাল কুক্ষি জল বিহনে যেন খাঁ খাঁ করিয়া পুড়িয়া যাইতেছে। একদিন নিশিত রাতে বাদশাহ্র নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্বক আপন শয্যায় উপবিষ্ট হইলেন। বাদশাহ্র মনে দীঘির তাদৃশ অবস্থা নিদারুণ আঘাত হানিতে লাগিল।

বাদশাহ্র আর সহ্য হইল না। তিনি উভয় হস্ত উত্তোলন করিয়া খোদার দরবারে প্রার্থনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী, এই বিশ্বধামে তোমার অগোচর কিছুই নাই, তুমি অকূলের কূল। তুমি বিপন্নকে উদ্ধার কর। তুমি সর্বজ্ঞ ও সর্বত্র বিরাজমান। আজ আমি বিপদে পড়িয়া তোমাকে আকুল আহ্বান করিতেছি। আমার মত হতভাগার ডাক কি

তোমার কর্ণে স্থান পাইতেছে না। যুগে যুগে পান্থগণ যদি এই জলাশয়ের পানি পান করিতে না পারে তবে আমার তথা তোমার সার্থকতা রইল না। তোমার আদেশ ব্যতিরেকে বৃক্ষ হইতে একটি পত্রও চ্যুত হয় না। তোমার আদেশেই আমি উক্ত দীঘি খননের কাজে হাত দিয়াছি। আজ কেন আমার আশা অপূর্ণ থাকিবে। এক বিন্দু জল দানে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

বাদশাহর তাদৃশ আবেদন আল্লাহর দরবারে মঞ্জুর হইল। কিয়ৎকাল বাদশাহ্ আপন শরীরটাকে এলাইয়া দিলেন। নিদ্রাদেবী বাদশাহ্র চোখে ঘুম আনিয়া দিল। তারপর বাদশাহ দেখেন যেন এক শ্বেত শ্মশ্রুধারী বিরাটকায় পুরুষ তাঁহার শিয়রের সামনে দাঁড়াইয়া বাদশাহকে বলিতেছেন, "বৎস, চিন্তা করিওনা। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। তুমি আগামীকল্য মধ্যাহ্ন কালে তোমার দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় একটি পাঁঠা বলিদানের বন্দোবস্ত কর। আর কিছু আমোদ স্ফূর্তির ব্যবস্থা কর।

তারপর হঠাৎ উক্ত সাধু পুরুষটি অন্তর্হিত হইয়া গেল। সাথে সাথে বাদশাহ্রও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। নিদ্রা হইতে উঠিয়া বাদশাহ আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। স্বপ্নের রেশটুকু যেন এখনও বাদশাহর মহল খানার মধ্যে রি রি করিয়া ঘুরিতেছে। বাদশাহর ঐ রাত্রে আর ঘুম হইল না। স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপারটার পর্যালোচনা করিতে নিশা অতিক্রান্ত হইয়া গেল। পূর্ব দিগন্তে সূর্য যখন উদিত হইল তখন বাদশাহ তাঁহার লোকজনকে বলিলেন— "তোমরা একটা বড় পাঁঠা যোগাড় কর। আর গান বাজনার বন্দোবস্ত কর। আজ আমার দীঘিতে আমোদ করিতে হইবে।"

বাদশাহ্র আদেশমত সবকিছুর আয়োজন করা হইল। পাঁঠা বলিদানের পর শুরু হইল নাচ আর গান। সেইদিন গায়ক বাদক আর নর্তকীদের নৃত্যের ছন্দে হাজীগঞ্জের আকাশ বাতাস পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। গায়কবৃন্দের গানের লহরীলালায় নৃত্য পটীয়সীদের নৃত্যের ছন্দে হাজীগঞ্জের মৃত্তিকায় কম্পনের সৃষ্টি হইয়াছিল।

শিল্পীবৃন্দ মস্তাসক্তের মত পাগল প্রায় হইয়া গান বাজনায় নিমগ্ন। এমন সময় হঠাৎ দীঘিতে একটা কম্পনের সৃষ্টি হইল। শিল্পিগণ আমোদ-প্রমোদে

এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা ব্যাপারটা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিল না। দীঘির কম্পনের অব্যবহিত পরেই জলাশয়টির ঠিক মধ্য অংশ হইতে একটা বিষম শব্দ উত্থিত হইল। তাহার সাথে সাথেই আচমকা পানিতে দীঘিটা সম্পূর্ণরূপে ভরিয়া গেল। গায়ক বাদক আর নর্তকীবৃন্দ আর দীঘির পাড়ে উঠিতে পারিল না। দীঘির পানিতে ডুবিয়া উক্ত "নাডের দল" মারা গেল।

এইজন্য ইহাকে "নাডের দীঘি" বলে। হাজীগঞ্জের বুকে দীঘিটি আজও আপন সত্ত্বা নিয়া বিরাজমান।

চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জেলা থেকে বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক
জনাব আবদুস সাত্তার চৌধুরী 'কুড়াকাডা', ও 'ছাআলী
খোন্দকারের কিংবদন্তী দু'টি সংগ্রহ করেছেন।
তাঁর ঠিকানা—গ্রাম : হুলাইন (দক্ষিণ),
ডাকঘর : এয়াকুবদণ্ডী,
জেলা : চট্টগ্রাম।

ছাআলী খোন্দকারের কিংবদন্তী

চট্টগ্রাম জিলার রাউজান থানার অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামে মৌলভী ছানাউল্লাহ্ নামক জনৈক খোন্দকার স্ব-পরিবারে বাস করিতেন। তাহার পূর্বপুরুষগণ গৌড় হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। মৌলভী ছানাউল্লাহ্‌র পিতা নাসিরুদ্দিন শাহ প্রথমে এই নয়াপাড়া গ্রামে আসিয়া বসতি বিস্তার করেন। তৎকালে এই অঞ্চল মগরাজ কর্তৃক অধ্যুষিত ছিল। উক্ত নাসিরুদ্দিন শাহ্ পরে বাংলার শায়েস্তা খাঁ কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজিত হইলে স্থানীয় কাজী হিসাবে নিয়োজিত হন। বর্তমানে সেই কাজীর দরবার এখন সাব-রেজিষ্টার অফিস হিসাবে হাটহাজারী থানায় বিদ্যমান। নাসিরুদ্দিন শাহ্ কাজীর সনদপ্রাপ্ত হইয়া প্রথমে উক্ত নয়াপাড়া গ্রামে একটি সাধারণ ঘরে বসিয়া বিচার কার্য করিতেন। কিছুদিন পর উপরস্থ আমলা কর্তৃক একটি মজলিশ ঘর নির্মাণের জন্য আদেশ প্রাপ্ত হইলে মজলিশ ঘর নির্মাণের জন্য উপকরণাদি সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত হয়। এই উপলক্ষে মৌলভী ছানাউল্লাহ্ মিয়া কয়েকজন কর্মী লইয়া রাঙ্গুনিয়া থানায় অবস্থিত বর্তমান ইছামতী নদীর উপকুলের জঙ্গল হইতে গাছ, বেত, বাঁশ কাটিয়া আনিতে গিয়াছিলেন। উক্ত ছানাউল্লাহ্ মিয়ার কর্মিগণ প্রয়োজনীয় বাঁশ, বেত ইত্যাদি কাটিয়া রাঙ্গুনিয়া থানার পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত ইছামতী (কর্ণফুলীর উপনদী) নদীর স্রোতের অনুকুলে ভাসাইয়া দিয়া নোয়াপাড়া গ্রামের দিকে আনিতেছিল। কিছু দূর ভাসাইয়া আনিবার পর ইছামতী নদীর মোহনার অর্ধ মাইল উপরের দিকে হঠাৎ তাহাদের বাঁশ ও বেতের চালি আটাকাইয়া যায়। বহু পরিশ্রমের পরও বাঁশ ও বেতের চালি এদিক ওদিক সরাইতে না পারিয়া কর্মিগণ হতাশ হইয়া উক্ত ছানাউল্লাহ মিঞা ওরফে ছাআলী খোন্দকারকে উক্ত বিষয় অবগত করান। জনশ্রুতি আছে, যেই স্থানে ছানাউল্লাহ্ মিঞার বাঁশ ও বেতের চালি আটকান ছিল সেইখানে ইছামতী নাম্নী এক দানবী বাস করিত। এই ইছামতী নাম্নী দানবীর নামানুসারেই উক্ত নদীর নাম হইয়াছে ইছামতী। ইহা

খুব খরস্রোতা নদী। বর্ষাকালে ইহার জলে দুই কুল প্লাবিত করিয়া বহু ঘর বাড়ী নষ্ট করে। তৎকালে এই ইছামতী দানবীর প্রকোপে পতিত হইয়া বহু নৌকা, সাম্পান, নদীর জলে চিরতরে নিমজ্জিত হইয়া আছে। ইহাতে উক্ত ছানাউল্লাহ মিঞা ক্রোধান্ধ হইয়া উক্তস্থানে গিয়া বহু মন্ত্র আওড়াইয়াও সুফল প্রাপ্ত হন নাই। অবশেষে তাঁহার মন্ত্রের জোরে ইছামতী দানবী ছানাউল্লাহ মিঞার লোকজন কর্তৃক সংগৃহীত বাঁশ ও বেতের চালি উপরে উঠাইয়া দেয়। কিন্তু ইহাতে ছানাউল্লাহ মিঞা পরিতোষ লাভ না করিয়া উক্ত ইছামতী দানবীকে বলিল যে, "আমি ছানাউল্লাহ। আমাকে লোকে ছাআলী খোন্দকার বলিয়া অভিহিত করে। তুই কেমন দানবী আমি স্বচক্ষে দেখিব। তুই আজ অবধি বহু অনিষ্ট সাধন করিয়াছিস্, আমি তোকে কিছুতেই উপরে না উঠাইয়া এখান হইতে যাইতেছি না।" কিন্তু ইছামতী দানবী কিছুতেই জলের উপরে উঠিতে চায় না। কাজেই উক্ত ছানাউল্লাহ মিঞাজী মন্ত্রের দ্বারা প্রথমে জলের উপরে ইছামতী দানবীর মস্তক তুলিলেন, তারপর গলা পর্যন্ত, তারপর কটিদেশ পর্যন্ত উপরে উঠাইলেন। তখন নাকি ইছামতী দানবী বহু অনুনয় করিয়া বলিয়াছিল, অনতিবিলম্বে সে উক্ত স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবে। এদেশে আর সে থাকিবে না এবং কাহারও অনিষ্ট সাধন করিবেনা। ইহাতে উক্ত ছানাউল্লাহ নাকি ইছামতী দানবী হইতে এক ছাড়পত্র লইয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ছাড়পত্রে লেখা ছিল উক্ত ইছামতী দানবী অন্য কাহারও অনিষ্ট করিবে না এবং অনতিবিলম্বে সে দৈত্য দানবের দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য থাকিবে। কিন্তু উক্ত ছানাউল্লাহ মিঞার যে অনিষ্ট করিবে না, ইহা উল্লেখ ছিল না। ছানাউল্লাহ মিঞাও উহা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। তারপর ছানাউল্লাহ মিঞা লোকজনসহ বাঁশের ও বেতের চালি লইয়া নোয়াপাড়া গ্রামে আসিয়া মজলিস ঘর নির্মাণ করেন এবং আপন কর্তব্য করিয়া যান। তদবধি উক্ত ইছামতী দানবী উক্ত স্থান ত্যাগ করিয়া দৈত্য দানবের দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন বটে কিন্তু ছানাউল্লাহ মিঞার উপর তাহার বৈরী ভাব রহিয়া গেল। প্রতিদিন রাত্রে আসিয়া ছানাউল্লাহ মিঞাকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিত কিন্তু ছানাউল্লাহ মিঞার আলৌকিক ক্ষমতা গুণে দানবীর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। একদিন রাত্রি

কালে ছানাউল্লাহ মিঞা নাকি প্রস্রাব করিয়া জলশুচি করিবার আগে এদিক ওদিক পায়চারী করিবার সময় হঠাৎ কোথা হইতে উক্ত দানবী আসিয়া এক ঝাপটায় শূন্যের উপর তুলিয়া পুনরায় ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণ বায়ু বাহির করিয়া দেয়। এইভাবে উক্ত ছানাউল্লাহ মিঞার জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয় এবং উক্ত দানবী তাহার বৈরী ভাব উদ্ধার করিয়া দৈত্য দানবের দেশে চলিয়া যায়।

জনশ্রুতি আছে যে, উক্ত ছানাউল্লাহ মিঞা নাকি যখন মন্ত্র আওড়াইতেন তাঁহার মুখ দিয়া নাকি আগুন বাহির হইত। অদ্যাবধি তাঁহার তৎকালীন বাস্তু ভিটায় তাহার উত্তরাধিকারিগণ বাস করিতেছেন।

কুড়া কাডা মসজিদের পুরাতত্ত্ব

চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত পটীয়া থানার "হরিণ খাইন" গ্রামের দক্ষিণ পূর্বাংশে এই মসজিদ অবস্থিত। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে উক্ত হরিণ খাইন গ্রামের জনৈক দরিদ্র পরিবারের সন্তান আবদুল ওহাব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত আবদুল ওহাব মুন্সী আবদুল ওহাব নামে খ্যাত। তদীয় মাতার অপরিসীম প্রচেষ্টায় মুন্সী আবদুল ওহাব ফারসী ভাষায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তারপর তিনি চট্টগ্রাম সদর আদালতে মুন্সীগিরির কাজ করেন। তিনি চট্টগ্রাম আদালতে মুন্সীগিরি কাজ করিবার সময় তাঁহার মাতাকে লইয়া শহরে বাসা করিয়া থাকিতেন। কিছু দিন পর মাতাপুত্র দুইজন মিলিয়া চট্টগ্রামের জিন্দাপীর মরহুম শাহ আমানতের আশ্রয় নেন। মাতা-পুত্র দুই জনই শাহ আমানতের খেদমতে রত ছিলেন। এক দিন আবদুল ওহাব মুন্সী শুনিতে পাইলেন যে চট্টগ্রামের আদালতে "আলা সদর আমীন" নামক একটি সরকারী উচ্চ পদস্থ পদে একজন ভাল ফারসী শিক্ষিত লোক নিয়োগ করা হইবে। তৎকালে সরকারী আদালতে ফারসী ভাষাই রাজভাষা হিসাবে প্রচলিত বলিয়া উচ্চপদস্থ সরকারী পদে ফারসী ভাষায় শিক্ষিত লোক নিয়োগ করা হইত। আবদুল ওহাব এই খবর তাহার মাতাকে জানাইলে তাঁহার মাতা শাহ আমানত সাহেবকে অনুরোধ করিলেন যেন আবদুল ওহাব মুন্সী উক্ত চাকুরীটি পাইতে পারেন। আবদুল ওহাব মুন্সীর মাতার সেবায় শাহ আমানত সাহেব বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। সেই দিনই শাহ আমানত সাহেব আবদুল ওহাব মুন্সীকে হাত ধরিয়া বর্তমান চট্টগ্রাম শহরের মধ্যভাগে যে পরীর পাহাড় অবস্থিত আছে সেই পাহাড়ের টিলার উপর নিয়া বলিলেন "যাও আবদুল ওহাব, তুমি আজ থেকে 'আলা সদর আমীন'। তোমার চাকুরী হইল।" তারপর একটা কাগজে নাকি কিছু লিখিয়া আবদুল ওহাব মুন্সীর হস্তে দিয়া বলিলেন, "এই কাগজখানি আদালতে দেখালেই তোমার চাকুরী হইয়া যাইবে।" শাহ আমানত সাহেবের কথামত মুন্সী আবদুল ওহাব উক্ত কাগজখানি আদালতের বড় কর্তার হস্তে দেওয়া মাত্র

আদালতের বড় কর্তা তখন মুন্সী আবদুল ওহাবকে আলা-সদর আমীনের পদে অলঙ্কৃত করেন। চাকুরীতে নিযুক্ত হওয়ার পরেও মুন্সী আবদুল ওহাব এবং তাঁহার মাতা শাহ সাহেবের খেদমত হইতে দূরে সরিয়া পড়েন নাই।

আর একদিন মুন্সী আবদুল ওহাব শাহ সাহেবের অনুমতিক্রমে তাঁহার মাতাকে লইয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া নূতন বাড়ী তৈয়ার করিতে মনোনিবেশ করেন। বাড়ী ঘর প্রস্তুত হইলে তাহার মাতার আদেশে উক্ত গ্রামে একটি মসজিদ স্থাপনের চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে মুন্সী আবদুল ওহাব তাহার বাড়ীর সংলগ্ন কিছু জমি খরিদ করিয়া একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। তৎকালে পারিপার্শ্বিক দুই চারিটি গ্রামের মধ্যেও কোন মসজিদ ছিল না। বিদেশ হইতে সুদক্ষ কারিগর আনাইয়া এই মসজিদটি পাকা করিয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন। ইটের পাকা গাঁথুনী মজবুত করিবার জন্য বহু টাকার মালমসলা তিনি বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াছিলেন। মুন্সী আবদুল ওহাবের সুদীর্ঘ বিশ বছর চাকুরীর পর এই মসজিদ পাকা করিবার ব্যবস্থা করেন। মসজিদটি পাকা করিতে কত টাকা ব্যয় হইবে ইহার হিসাব সম্বন্ধে শাহ সাহেব নাকি বলিয়াছিলেন "আল্লাহুর ওয়াস্তে যাহা খরচ হয় তাহার হিসাব করা ন্যায় সঙ্গত নয়।

শুনা যায়, কারিগরগণকে প্রত্যহ বেতের নির্মিত একটি পাত্র (প্রায় পাঁচসের) ওজন করিয়া পারিশ্রমিকের টাকা দিতেন। সুদীর্ঘ বার বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এই মসজিদ গঠন করা হয়। মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ২২ হাত এবং প্রস্থে ১০ হাত। সম্মুখ ভাগে তিনটি দরজা। মধ্যের দরজাটি বেশ বড়। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুইটি জানালা আছে। মসজিদের সম্মুখভাগে বিরাট চেহেন। চতুষ্পার্শ্বে পাকা গাঁথুনির দেওয়াল। তিনটিগম্বুজ। মধ্যভাগে যে গম্বুজটি আছে উহা বিরাট। দূর দূরান্তের গ্রাম হইতে ঐ গম্বুজ স্পষ্ট দেখা যায়। দেওয়াল খুব পুরু। ইটগুলি ছোট ছোট ; দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ প্রায় সমান মাত্র এক ইঞ্চি পুরু। আজিও এই মসজিদের গগন চুম্বী গম্বুজগুলি মুন্সীর কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। আবদুল ওহাব মুন্সী এই মসজিদ স্থাপনের চেষ্টায় রত থাকায় ভূ-সম্পত্তি খরিদ করার চেষ্টা করে নাই। সামান্য কিছু ভূ-সম্পত্তি খরিদ করিয়া এই মসজিদের জন্য ওয়াকফ করিয়া যান। উক্ত সম্পত্তি "বাহালী জিম্মা করিমজান" নামে খ্যাত।

মুন্সী আবদুল ওহাব তাঁহার বাড়ী হইতে চট্টগ্রাম শহরের দক্ষিণ কুল পর্যন্ত ৬ মাইল রাস্তা তৈয়ার করেন। যাহাতে চট্টগ্রাম শহরের নামজাদা আমলাগণ তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিতে পারেন। আর একবার মুন্সী আবদুল ওহাব মুন্সী ছালামত আলী খাঁকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন। ছালামত আলী খাঁ নাকি বলিয়াছিলেন এতদূর পথ পাল্কীতে আরোহণ করিয়া নিমন্ত্রিত বাড়ীতে আসিতে পারিবেন না। নৌকা সাম্পানের পথ হইলে বিবেচনা সাপেক্ষ ছিল। এই মর্মে মুন্সী আবদুল ওহাব তাহার বাড়ী হইতে চার মাইল খাল কাটাইয়া চানখালী খালের সহিত যুক্ত করিয়া দেন। এইভাবে যোগাযোগের ব্যবস্থা করিয়া সুদূর পল্লী অঞ্চলের বাড়ীতে মুন্সী আবদুল ওহাব বহু গন্য মান্য ব্যক্তিকে তাঁহার বাড়ীতে নেওয়ায় সক্ষম হয়।

মসজিদ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুন্সী আবদুল ওহাব এক বিরাট জেয়াফতের আয়োজন করেন। এই জেয়াফত এক শুক্রবার হইতে আর এক শুক্রবার পর্যন্ত চলিয়াছিল। জেয়াফতের শেষ দিন একটি বিশেষ ভোজের ব্যবস্থা করিতে গিয়া মুন্সী আবদুল ওহাব চট্টগ্রাম শহরে গিয়া শাহ আমানত সাহেবকে দাওয়াত করেন। শাহ আমানত মুন্সী আবদুল ওহাবকে বলিয়াছিলেন যে, "জেয়াফতে ছোট বড় সকলকে এক সমান জানিতে হইবে। নতুবা জেয়াফতের পুণ্য হাসেল হয় না, আর আমি তোমার জেয়াফতে যাইতে পারিব না। তুমি আমাকে আর অনুরোধ করিও না। আমি যেমন আছি তেমনি ভালই আছি। তোমার জেয়াফত আমি কবুল করিলে শেষ পর্যন্ত তোমার মনে শান্তি পাইবে না বলিয়া আমার ধারণা। তুমি যে বড় লোকের সম্মানার্থে বিশেষ ভোজের ব্যবস্থা করিতেছ সেই ভোজ-সভায় বোধ হয় আমার ইজ্জৎ তুমি বুঝিতে পারিবে না।" কিন্তু আবদুল ওহাব মুন্সী নাছোড় বান্দা। অবশেষে আবদুল ওহাব মুন্সীর বিশেষ অনুরোধে শাহ আমানত সাহেব নিমন্ত্রণ কবুল করিলেন। নিমন্ত্রণের নির্দিষ্ট তারিখে বিশেষ ধরনের গন্য মান্য লোক ভোজ সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু শাহ আমানত সাহেবকে দেখা যায় না। আবদুল ওহাব মুন্সী মনে করিলেন তিনি আর আসিবেন না। সবাই আহারে রত আছেন এমন সময় সর্বাঙ্গে ক্ষতযুক্ত এক

দরিদ্র লোক নাকি ভোজ সভায় উপস্থিত হইয়া সভার মাঝখানে উপবিষ্ট হইলেন, এমন সময়—ভোজ সভার অন্যান্য অতিথিগণ শাহ্ আমানত সাহেবকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহাকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য আবদুল ওহাব মুন্সীকে অনুরোধ করেন। আবদুল ওহাব মুন্সী তাহার চাকরগণকে হুকুম করিলেন যে, এই ভিক্ষুক বেশী রোগা লোকটিকে যেন ভোজসভা হইতে তাড়াইয়া দেয়। চাকরেরা আবদুল ওহাব মুন্সীর হুকুম পাইয়া উক্ত লোকটিকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া এবং মারপিট করিয়া তাড়াইয়া দেয়।

কিছুদূর গমন করার পর শাহ সাহেব অদৃশ্যভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ওহে আবদুল ওহাব, আমি তোমাকে আগে বলিয়াছিলাম জেয়াফতের সময় সবাইকে এক সমান জানিতে হইবে। এখন তুমি ঐ ভিক্ষুক বেশী দরিদ্র রোগা লোকটিকে তাড়াইয়া দেওয়ার অর্থ হইল আমাকে অপদস্থ করা ও আমার মান হানি করা। যাহা হউক তুমি আমার উপদেশ গ্রহণ না করায় আজ অবধি তোমার আর দুনিয়াতে শান্তি হইবে না। তোমার নিম্নতম পুরুষ অবধি পাগল থাকিবে। "কিছুক্ষণ পরে সেই বাণী আর শুনা গেল না। তার পরদিন আবদুল ওহাব মুন্সী আর আবদুল ওহাব মুন্সীর মাতা চট্টগ্রাম শহরে শাহ আমানত সাহেবের খানকায়ে গলবস্ত্র হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, শাহ আমানত সাহেব নাকি বলিয়াছিলেন, যাহা করা হয় তাহা একবারই করা হয়, আর যাহা বলা হয় তাহা দুইবার বলা হয় না। অতঃপর আবদুল ওহাব পাগল বেশে ঘুরিতেছিলেন। এখন আবদুল ওহাব মুন্সীর সপ্তম পুরুষ অতিবাহিত হইয়াছে। অষ্টম পুরুষে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু অদ্যাবধি অতীতের আবদুল ওহাব মুন্সীর কীর্তি এই প্রাচীন মসজিদ কর্তৃক ঘোষিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, মসজিদ নির্মাণের পর জেয়াফতের সময় আবদুল ওহাব মুন্সীর পরিবার কর্তৃক ১০০টি (একশতটি) মোরগ জবাই করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের মসজিদে রেওয়াজ মতে, মেয়েলোক দ্বারা মোরগ কিম্বা অন্যান্য প্রাণী জবাই করা অন্তত সেকালের জন্য দোষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। মেয়েলোক কর্তৃক মোরগ জবাইর খবর প্রতিবেশী মহলে জ্ঞাত হইলেই প্রতিবেশীরা বিদ্রুপ করিয়া এই মসজিদের নাম আবদুল ওহাব মুন্সীর নাম না দিয়া কুঁড়া কাডার মসজিদ নামে অভিহিত করেন।

ঢাকা

ঢাকা জেলা থেকে এই আঠারোটি কিংবদন্তী সংগ্রহ করেছেন, বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব আবদুর রহমান ঠাকুর। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

কান্দরের ধুচুন্নী

ধাম শরের চকের[১] ছোট এ্যাটা[২] বিলের নাম কান্দর। ধাম শরের চকটা খুব বড়। মধ্যখান থিক্যা[৩] ডাক দিলে চাইর মুইর‍্যার[৪] কুন গেরাম থিক্যা শুনা যায় না। ঐ চকের মইদ্দে[৫] অনেকটি[৬] বিল আছে। তার মইদ্দে কান্দর হগ্‌গলের চাইয়া ছোট[৭] বিল।

চকের বিল গুইন্যার[৮] মইদ্দে অনেক মাছ থাহে[৯]। অনেক মানুষ মাছ মাহরতে যায়। মাছ মাইরব্যার যাইয়া অনেকেই নানানতা[১০] দেইখ্যা ডরায়।

রাতুইব্যার[১১] গুইটা[১২] যেমুন, আমাগো হালটপ্পা আমাগো বাড়ী মুহি আসপার লাগচে।[১৩] তার গাহানের[১৪] আওয়াজ পাইয়া আমি তার জন্যে দেরী করতাচি। কতা[১৫] আচিল দুইজনে একসাত[১৬] মাছ মাইরব্যার যামু[১৭], কিন্তুক[১৮] গুইট্যা শয়তান, করচে কি,[১৯] আমারে ডাক না দিয়াই টুট্যামের[২০] খাল মুহি চইল্যা গেছে।

ম্যাগ[২১] মান্দারী রাইত। কতক্ষুন[২২] ম্যাগ অইয়া[২৩] গেছে। আষাইঢ্যা ম্যাগ[২৪] কিনা তাই বেশীক্ষুন থাহেনা[২৫] ছ্যারত ছ্যারত আহে[২৬], আর ছ্যারত ছ্যারত যায়।

১। মাঠের ২। একটা ৩। হইতে ৪। চারিদিকের
৫। মধ্যে ৬। অনেকগুলি ৭। সকলের চাইতে ক্ষুদ্র ৮। গুলির
৯। থাকে ১০। নানারকম ১১। রাতুবিয়ার (গ্রামের নাম)
১২। গুটা (মানুষের নাম) ১৩। লাগছে ১৪। গানের
১৫। কথা ১৬। একত্র ১৭। যাব ১৮। কিন্তু
১৯। করিয়াছে কি ২০। টুটিয়ামের (গ্রামের নাম) ২১। মেঘ
২২। কতক্ষণ ২৩। হইয়া ২৪। আষাঢ়ে বৃষ্টি ২৫। থাকেনা
২৬। এই বৃষ্টি আসে এই যায়,।

হুইটা যহন আমারে থুইয়্যা[২৬] অন্তহানে একলাই চইল্যা গেল, তহনে আমি আর অন্ত কুন[২৭] সাতী না পাইয়া একলা একলা দুমন্দয়াশার[২৮] সাত এক পাও আইগাই[২৯] এক পাও পাইছাই, এমনি করতে করতে কান্দরের পাড়ে গেলাম। বিলের পাড়ে আর কুন মানুষ জন দেহিনা[৩০]। বিলের কান্দা দিয়া আইগিয়া যাইত্যাছি। আমার হাতে আছে একগাছী যুতী[৩১]। সুমায়[৩২] সুমায় আমার ডর লাগ্‌তাছে আবার কিচুডা[৩৩] সাহসও করি কিছুদূর যাইয়া দেহি ছেরে পায় ধব্‌ধবা ধলা কাপড় দিয়া শুইয়া রইচে মস্তবড় একটা এ্যাহাবারে[৩৪] পুইরা পাঁচ হাত। আমারে দেইহ্যা[৩৫] বুইড়া ধুচুন্নী মাথার কাপড় ফালাইয়া[৩৬] দিল। দেহি[৩৭] দুই চোখ এ্যাকেক[৩৮] কালে জ্বল্ জ্বল্ করতাচে। ছ্যামায়[৩৯] ও যাইবার পারিনা। পাইছিয়াও আস্‌পার যুগার নাই। পাইছিয়া আসলে এ্যাহাবারে জম্মের মত সারব। হাতের যুতী হাতে রইছে—যেমুন[৪০] উডা একটা হুক্কা উডা যে একটা যন্তর[৪১] তা আমার মুনে উইস্তায়[৪২] অইলনা। ভয়ের চোটে আমার শরীলের[৪৩] লোম জাগ্‌স্তা খাড়াইচে। এমুন সুমায় আমার হাতের যুতি ঝাপট কইর‍্যা উঠ্‌ছে—আমি এ্যাহাবারে ছিট্‌টা উঠ্‌চি—এ আবার কি আহে[৪৪]। পাছে চাইয়া দেহি আবোছ চাচাজান আমার ঘার থিক্যা যুতী কাইড়্যা[৪৫] নিচে। হে তহনি ধুচুন্নীর উপর কোপ লাগাইল। ধুচুন্নী বুড়ীর কুহানের আওজ[৪৬] পাইলাম—আর কিচু[৪৭] দেখলাম না।

ইয়ার কয়হাক দিন[৪৮] পরে ধমশরের হাট থিক্যা বাঁশ কিন্ত্যা[৪৯] বাড়ী আস্‌তাচে আবোছ চাচামিয়া। হে[৫০] একলা পরচিল। রাইত[৫১] বেশী

২৬। ফেলিয়া ২৭। অন্য কোন ২৮। দুই মন দুই আশার
২৯। অগ্রসর ৩০। দেখিনা ৩১। মাছ মারা যন্ত্র ৩২। সময়
৩৩। কিছুটা ৩৪। একেবারে ৩৫। দেখিয়া ৩৬। ফেলিয়া
৩৭। দেখি ৩৮। একেবারে ৩৯। সামনেও ৪০। যেন
৪১। যন্ত্র ৪২। উদয় ৪৩। শরীর ৪৪। আসে
৪৫। কাড়িয়া ৪৬। কোকানের আওয়াজ ৪৭। কিছু

অয় নাই। কেবলই নিম্ম্যা[৫২] যাম পার অইয়া[৫৩] গেছে। ঐ কান্দার বিলের পার দিয়া চাচামিয়া আস্তাচে। পাছু থিকা[৫৪] আর বাঁশ টাইন্যা[৫৫] ধল্লো বুড়ী ধুচুন্নী। আর ছাড়েনা। অর[৫৬] আছে সেই দিনের রাগ। কতক্ষুন টানাটানি করার পর চাচামিয়া রাইগ্যা বাঁশ ফালাইয়া দিয়া আসিল।

চাচামিয়া দানবী মনতোরে[৫৭] খুপ[৫৮] শক্ত আছাল। পরের দিন সক্কালে[৫৯] সগলে দেখিল চাচামিয়ার বাড়ীর ছাম্নে বাঁশ পইড়া রইচে। মনতোরের চোটে বুড়ী ধুচুন্নী বাঁশ মাথায় কইর‍্যা আইন্যা থুইয়া[৬০] গেছে।

মিয়া সাহেব এই গপ্প দাদার মুহে[৬১] হুন্‌ছিল্যাম হ্যাংটা কালানে—অয়তো ঠিক ঠেনহা[৬২] মত হগ্‌গল কতা কইব্যার পাল্লামনা, যেটুং[৬৩] মনে আছাল তাই কইল্যাম।

৪৮। কয়েক দিন ৪৯। কিনিয়া ৫০। সে ৫১। রাত্রি
৫২। সন্ধ্যার ৫৩। হইয়া ৫৪। হইতে ৫৫। টানিয়া
৫৬। ওর ৫৭। মন্ত্র ৫৮। খুব ৫৯। সকালে ৬০। রাখিয়া ৬১। মুখে ৬২। ঠিকমত ৬৩। যেটুকু।

গাছ কান্দার চকের আলোক লতা

মুরুব্বিরা কইচে[১] গাছ কান্দার চকে[২] রাইত বিনাইত বড় কেওই[৩] যাইতনা। ঐ জাগার মইদ্দে[৪] মইদ্দেই আলোক লতার খ্যালা অইত[৫]

আমাগো গাও গেরামের ছোট ছুইট্কা জোর ঝাপের[৬] উইপ্যার[৭] হইলস্থা[৮] রঙ্গের সুইত্যার[৯] মত এক রকম লতা স্থাখা যায়। সেই লতা গুইল্যা দেইখতে সুন্দর, উরা[১০] পরগাছা। ঐ গুইল্যারে[১১] আলোক লতা কয়। কিন্তুক[১২] গাছকান্দার চকের[১৩] আলোকলতা আলাদা চিজ। একবার তা দেইখলে জীবের জ্ঞান থাহে না[১৪]

আক্কেল মুল্লার দাদা কুইন্থা মুল্লা একবার গাড়ীতে কইর‍্যা[১৫] মটর কলই আইন্‌ব্যার জন্যি ঐ চকে যায়। যাওয়ার সুমায় তার পাড়াপের্‌তি[১৬] বেশীর‍্যা কইল, স্থাহরে[১৭] মুল্লাজী তুমি রাইত কইর‍্যা ঐ চকে যাইওনা।

তেমুনি নাজানি কইর‍্যা[১৮] মুল্লা গাছ কান্দার কেমুহি[১৯] ম্যালা দিল। য্যান[২০] সে মইদ্দে[২১] চকে গেছে ত্যান নজর কইর‍্যা চাইয়্যা স্থাখে তার চাইরমুর[২২] ঘির‍্যা শত্‌কে[২৩] শত আগুনের পাতিল্যা ধাউ ধাউ কইর‍্যা জইল্যা নীলা-খেলা কইরত্যাছে। চাইরমুর থ্যা[২৪] সুমানে ঘির স্থা[২৫] তারমুহি ছুইট্যা আসে, আবার খ্যানেই[২৬] চাইরমুইর থ্যাই দূরে ছুইট্যা যায়। আবার চাইর মুরথ্যা ঘিরস্থা[২৭] আসে।

১। কহিয়াছে ২। মাঠে ৩। কেহ ৪। মাঝে ৫। খেলা হইত ৬। ঝোপের ৭। উপর ৮। হলুদ ৯। সুতা ১০। উহারা ১১। ওগুলিকে ১২। কিন্তু ১৩। মাঠের ১৪। থাকেনা ১৫। করিয়া ১৬। প্রতিবেশীরা ১৭। দেখ হে ১৮। করে ১৯। মাঠের দিকে ২০। যাহা মাত্র ২১। মধ্যে ২২। চারিদিক ২৩। শত শত ২৪। হইতে ২৫। দিয়া ২৬। ক্ষণেই ২৭। ঘিরে

দেইখ্‌তে দেইখ্‌তে ঐ আগুনের পাতিল্যা[২৮] গুইল্যা[২৯] আর আগুনের পাতিলা থাইক্‌ল না। উয়ার পেরতেক্‌টা থিক্যা[৩০] লেগের[৩১] সুমানমুটা আজার-আজার[৩২] আতনাম্বা[৩৩] আগুনের সুইত্যা অইয়্যা[৩৪] আশমান ছাইয়্যা ফালাইল।

চাইরমুর থ্যা[৩৫] আলোক লতা, মাথার উপর থ্যা আলোক লতা,জমিনের এক হাত উপুর থ্যা[৩৬] সুরু হইছে আর আশমানে যাইয়্যা ঠেক্‌চে—ইয়ার মইদ্দে খালি[৩৭] আলোক লতার জিলাপির প্যাছ।

কেরমেল[৩৮] মাথার উপুর ও চাইরমুর[৩৯] থ্যা[৩৯] চাইপ্যা[৪০] আইস্‌তে আইস্‌তে যহনে[৪১] ঐ আলোক লতা গলায় প্যাচ দিব্যার চায়, তখনে মুল্লাজী চিক্কুর দ্যা[৪২] চোখ বুজচে[৪৩]

মুল্লাজীর সাথে যে লোকটা আছিল সে এতক্ষুন ঘুমে আছিল। এই যে মুল্লাজী একলা একলা এত ডরাইচে তাও সাথের লোকটাকে ডাক থ্যায় নাই। মুল্লাজী জানে যে উলোকটা[৪৪] যুদি ইয়া[৪৫] থ্যাখে তয়[৪৬] উ আর ঠিক থাইক্‌প্যার পাইরব না।

আলোক লতা গাড়ীর কাছে চাইপ্যা আসার সাথে সাথেই গাড়ীর গরু দুইড্যা[৪৭] ভ্যাব্‌রানি ডাক ছাইর‍্যা দড়ি ছিড়্যা নুড়াইয়া[৪৮] গেল। ঠিক ঐ সুমায়ই মুল্লাজী চিক্কুর থ্যায়। এদারে[৪৯] মুল্লার চিক্কুইর, উদারে[৫০] গরুর ভ্যাব্‌রানি, এই দুই শব্দে সে লোকটা চ্যাতন হয়। চ্যাতন হওয়ার সাথে সে অজ্ঞান হয়। মুল্লাজী চাইয়্যা থ্যাখে কি ভরা আন্দার গুড গুড কইরতাছে, কুথায় বা আলোক লতা কুথায় বা কি।

২৮। পাতিল ২৯। গুলি ৩০। হইতে ৩১। আঙ্গুলের ৩২। হাজার হাজার ৩৩। লম্বা হাত ৩৪। হইয়া ৩৫। চারদিক দিয়া ৩৬। হইতে ৩৭। শুধু ৩৮। ক্রমশ: ৩৯। চারদিক হইতে ৪০। চাপিয়া ৪১। যখন ৪২। দিয়া ৪৩। মুদিয়াছে ৪৪। লোকটা ৪৫। ইহা ৪৬। তবে ৪৭। দুইটা ৪৮। দৌড়াইয়া ৪৯। এদিকে ৫০। ওদিকে

সাথের লোকটারে অজ্ঞান দেইখ্যা ওসের পানি দ্যা[৫১] মুল্লা তার চোখ মুখ মাথা ভিজাইব্যার লাইগ্‌ল। অনেকক্ষন পরে মনে হয় বুনি লোকটার কিছু কিছু জ্ঞান ফিরা৷ আইস্‌ত্যাছে। এমুন সুমায় জুংলা শুইয়্যার[৫২] বেগে খচ্‌খচ্‌খচ্‌ কইর‍্যা কলই[৫২]ভাইঙ্গ্যা চুইর‍্যা কি যুনি[৫৩] মচ্‌মচাইয়্যা আসে। তারা আইস্যা গাড়ীর মইদ্দে[৫৪] মারচে ধাক্কা। ইচোটে[৫৫] মুল্লা অজ্ঞিয়ান। সাথের লোকটার অল্প অল্প জ্ঞান ফির‍্যা আইস্‌ত্যাছে। সে যখন চোখ খুইল তখন স্থাখে গরু দুইড্যা গাড়ীর কাছে আইচে, মুল্লা অজ্ঞিয়ান, রাইত পরায় খল পুহা দিছে[৫৬]।

৫১। দিয়া ৫২। শুকর ৫২। (ক) কলাই (মটর) ৫৩। যেন
৫৪। মধ্যে ৫৫। এবারে ৫৬। প্রায় প্রভাত হইয়াছে।

ত্যাউতার পাক

বাপুরে আমরা ছোট্‌কালে ত্যাউতার পাকের গল্প হুনচি[১]। ত্যাউতার উইজ্যানে এক দুইর‍্যাস্ত পাক আচিল বুনি[২]। কত মাইনষের[৩] ক্ষতি যে করচে ঐ পাকটায় তা আল্লাই মালুম। মুরুব্বিগ্যারে[৪] কাছে হুনচি যে কত জাহাজ ট্যাইন্যা ধইর‍্যা কতক্ষণ তুরি[৫] ফিরাইয়া নাকচে[৬] কত মাইনষের নাও খাইচে ঐ পাকে। দূরে থ্যা[৭] যারা দেখচে তারা কয় পাকের মইদ্দে পরায়[৮] আতাছাব্বির[৯] সুমান গত হ্যাহা গেছে। বহুনে এ্যাটা নাও ঐ পাকের দুই খাদা বুই[১০] কাছে গেছে আর তহন রক্ষা নাই।

একবার এক জমিদার হাউস কইর‍্যা নতুন পানসী গাইথ্যা, হেই পানসীতি কইর‍্যা ছাওয়াল বৌ হগ্‌গলরে[১১] নইয়া ঐ নামি ডাকি পাক দেইখপ্যার জন্যি আইচিল। পাক দেহুন লাগে[১২] পরায় অর্দ্ধেক মাইল খাদ্দে[১৩] থাইক্যা। কেন্তুক ঐ জমিদার ব্যাটা কয়, কাছে যাইয়া না দেইখলে আর পাকের কি দেইখল্যাম। নাইয়ারা সাহস পায়না। তহন জমিদার কয়, কির‍্যারে[১৪] আদারিন্যা কিরে, তুই তো কথা মানস না। ঐ এরা[১৫] হারাইন্যা রে, ও হারান, আরে বাপু তুই একটু আইগিয়া দে—আর একটু, একটুখানি। য্যান আর একটু আইগিয়া দিছে অমনি পানসিডারে একই ঠেলায় একেকালে খাড়া কইর‍্যা পাকের গাতে নিল। নায়ের আগা গোলই গেল নীচে, পাছা গোলই শূন্যে আসমানে উহ্‌ঠল—এও[১৬] জোরে টান দিচিল। তান গো আর কেউ হ্যাহে নাই। মানুষ তো দূরে থাইক্‌ ও নাওই আর কোন দিন উঠে নাই।

১। শুনিয়াছি ২। নাকি ৩। মানুষের ৪। মুরুব্বিদের ৫। পর্য্যন্ত ৬। রাখিয়াছে ৭। হইতে ৮। প্রায় ৯। মানুষের চেয়ে এক হাত বেশী ১০। জমি ১১। সকলকে ১২। দেখিতে হয় ১৩। দূরে ১৪। কে রে ? ১৫। এরা ১৬। খুব

তার কিছুদিন পরে একজন মুত্তাকিন ঐ পাকের উইজ্যান থিকা একটা বাঁশের চালি নইয়া ভাইটিয়া আইসপ্যার নাগ্‌ছে[১৭]। বড় গাঙের পারে ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে বহুত মানুষ আচিল।

তাগো্যর ধান পাট খায় গরুতি[১৮] ভেরিতী। তারা ক্ষ্যাত পহরা দিবার জণ্ডি ক্ষ্যাতে গেচিল। হগগোল মাইনষে ঐ বাঁশের চালিয়ালা লোকটারে পাকের কাচে যাইবার না কইরল।

যমুইন্নার ধার। খাড়াখ[১৯] ঘাটের মইদ্দে তার বাঁশের চালি পাকের কাচে আইনন্যা ফালাইল। এ্যাহনে, কেম্‌নি কইয়্যা যে মুত্তাকিন মরে তা দেইখপ্যার জণ্ডি পরায় দুইশ আড়াইশ মানুষ গাঙের পারে আইগিয়া গেল।

পাক কিছুটা ছ্যামায় থাইকতে ঐ মুত্তাকিন কোরান শরিফ পাঠ শুরু কইর্‌ল। যহনে বাঁশের চালি পাকের কাছে আইল তহনে টানে থাইকা হগল[২০] মানুষেই দেইখল, ঠিক পাকের গর্তে থিকা ভুরো জটা দাঁড়িয়ালা মাইনষের আকিরাত[২১] এক দুইর‍্যাচার বোক সুমান জাগাইয়া উঠছে। হে হাত জোর কইর‍্যা কাইনত্যাছে, কইত্যাছে "আমারে আর সাজা দিবেন না। আপনে যা কন তাই করুম"।

তহনে মুত্তাকিন কয়—"তাই করবি ঠিকতো।" দুইর‍্যাচার কয়—"হা হুজুর তাই করুম।" মুত্তাকিন কয়—"জীবনে বহুত অন্যায় ছন্যায় কইরব্যার পারবি না। এ্যাহনে[২২] থ্যা[২৩] চইল্যা যাবি"।

তারপর থিকা ঐ পাক রায়টার ভাটীতে পদ্মায় চইল্যা গেছে। আর কেঐর অন্যায় ছন্যায় করে না।

১৭। আসিতেছে ১৮। গরুতে ১৯। মুহূর্তে ২০। সকল
২১। আকৃতি ২২। এখানে ২৩। হইতে।

নীল কুঠির আউলিয়া ও নাকু মুন্সী

নীল কুঠির খালের অনেক গপ্প মাইনষে কয় ছোট কালে আমি গপ্পডা মেহের আজী সাবের মুহে[১] হুনচিলাম।

সাহেব লোক যহন নীল চাষ করাইত তহনকার কতা[২]। কুঠিতে একজন কামেল আউলিয়া আচিল[৩]। হে[৪] গায়েব অইয়া[৫] থাক পার পারত। তহন কেও অরে দেখ্‌তে না কিন্তুক সে হগগলেরই দেখ্‌ত।

ঐ জাগার জমিদার বাড়ীর একজন রাখাল একদিন কুঠির খালের কাছ স্থা[৬] বাড়ী যাইত্যাছে। সে স্থাখে নীল খালের মুকের[৭] কাছে একজন লুক[৮] কি এ্যাটা[৯] জিনিস ধুইত্যাছে। তহনে সে একটা গাছের তলায় একটা জোপের কাচে খাড়াইয়া[১০] দেখে, ঐ লুকটা পেট থিক্যা[১১] নাড়ী ভুড়ী বাইর কইর্যা ধুইয়া তা আবার পেটের ভিতরে দিত্যাছে।

ঐ ছেইল্যাডা যহন এই কামডা[১২] দেইখল তহনে অল্প ইটু[১৩] ভিতরে দিব্যার বাদ আছে। যেটুং[১৪] বাদ আচিল[১৫] হেটুং ভিতরে দিতে আউলিয়ার খুবই কষ্ট অয়[১৬]। তহন[১৭] আউলিয়া হাকছাড়ে, যে আমারে এই কষ্ট করাইল তার য্যানি[১৮] ৬ মাস ঘুইর্যা না আসে। বাড়ী যাইয়া নাকু ঐ কথা মা বাপের কাছে কইল। হে[১৯] কইল যে, সাদু[২০] তারে বরদুয়া করছে।

তহনে তার মা বাপ তারে নইয়া সাধুর কাছে আইস্যা কয় আর কান্দে, হুজুর আপনে আমাগো মা বাপ, এ ছাওয়াল আপনেরে দিয়া গেলাম, আপনার যা খুসী তাই কইরব্যান, চাই আইজই মারেন আর ছয় মাসের মইদ্দেই মারেন।

১। মুখে ২। কথা ৩। ছিল ৪। সে ৫। হইয়া ৬। দিয়া ৭। মুখের ৮। লোক ৯। একটা ১০। দাঁড়াইয়া ১১। হইতে ১২। কাজটা ১৩। একটু ১৪। যেটুকু ১৫। ছিল ১৬। হয় ১৭। তখন ১৮। যেন ১৯। সে ২০। সাধু

নাক্কু ঐ মহতের কাছেই রইল। অনেকদিন তার কাছে আছিল। সে আচিল জমিদারের রাখাল। জমিদারের কাম বাদ দিয়া আউলিয়ার কাচে যাওয়াতে জমিদার খুব কুপিত অইছিল।

পরে ঐ ছেইল্যা যহনে বাড়ী ফিরুয়া আইস্যা সংসারী অয়[২১] তহন সে গেরামের মোল্লাকি কইরত—তারে মাইনষে কইত নাক্কু মুন্সী। নাক্কু মুন্সী জমিদারের এক আত্মিয়ারের মুসলমান কইর‍্যা বিয়া করে। জমিদার ব্রাহ্মণ। ইয়াতে[২২] সে আক্ক খিইপ্যা যায়।

বহুত অত্যাচার নাক্কু মুনশীর ঘড়ের উপইরস্যা যায়। একদিন ৩২ জন পাইক (জমিদারের মানুষ) নাক্কু মুন্সীরে নীল কুঠির খালের পারে দাবড়াইয়া ধরে। জমিদার তাগো কইচিল[২৩] নাক্কু মুন্সীর নাকের মাথা কাইট্যা[২৪] আইনবার পাল্লে বহু টাকা পুরস্কার দেব। তহনে[২৫] নাক্কু মুন্সী খালের পাড়ে বালুর মাইদ্দে[২৬] শুয়া পরে উপর হইয়া। তারে ৩২ জুইয়ানে নাঠি দিয়া চাড়া দেয় কিন্তক ইকটুও[২৭] নইড়ব্যার না পাইর‍্যা তারা ডরাইয়া ঘরে ফির‍্যা যায়। এসব শুন নাক্কু মুন্সী পায় ঐ নীল কুঠির আউলিয়ার কাছে।

এতদূর শিক্ক্যা[২৮] বিধ্যানের পরে একদিন নাক্কু কুঠিতে যাইয়া দেখে তার ওস্তাদ হেরে—পায় কাপড় মুরি দিয়া শুইয়া আছে। সে নাক্কুরে কয় তুই কাপড় খুলেক আমার মাথায় থিকা[২৯], তার পর আমি তর[৩০] সাথে কথা কই। নাক্কু কাপড় খুইল্যা দেখে সে মুড়[৩১] পাও আবার অন্য মুড় খুলে দেখে অও মুড়[৩২] পাও একবার এমুড়, আবার ওমুড় এমনি কইর‍্যা এক ঘণ্টা চেষ্টা করে, কিন্তক সব মুড় পাও।

২১। হয় ২২। ইহাতে ২৩। কহিয়াছিল ২৪। কাটিয়া ২৫। তখন
২৬। মধ্যে ২৭। একটুও ২৮। শিক্ষা ২৯। হইতে ৩০। তোর
৩১। সেদিকে ৩২। ওদিক

পেত্নী তলা

একটি মাঠের নাম পেত্নী তলা। মাঠটি পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার চোর মারা গ্রামে অবস্থিত। ইহা একটি আবাদযোগ্য মাঠ। মাঠের ভিতর দুই তিনটি পুরাতন বট গাছ ও একটি উজাড় ভিটা আছে। বহুদিন আগে এই ভিটাতে ছিলো একটি বাড়ী। বাড়ীটির নাম ছিল যুগী বাড়ী। এক যোগী এই বাড়ীতে বাস করিত। সেই যোগীর কেহই ছিলনা। সে একা একা সেই বাড়ীতে বাস করিত। যোগী নানা রকম তন্ত্র মন্ত্র জানিত। সে মন্ত্র দিয়া নাকি দেশের সব ভূত ডাকিয়া আনিতে পারিত। ভূতেরা তাহার পা টিপিয়া দিত। পেত্নী তাহার বাড়ী পাহারা দিত। তখন মাঠের নাম ছিল যুগীর চরা। একবার সেই যোগী পেত্নীদের বাড়ী পাহারায় রাখিয়া বিদেশে চলিয়া গেল। সেই যে গেল আর আসিলনা। হয়তো কোন খানে মরিয়া গিয়াছে। বাড়ী ঘড় আস্তে আস্তে ধ্বংস হইয়া গেল। কিন্তু ভূত-পেত্নীগুলি আজো সেই ভিটা পাহারায় আছে। কেনন। যোগী যে মন্ত্রে তাহাদের আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, তা হইতে তাহারা আজও মুক্তি পায় নাই। ভূত পেত্নী সারা রাত্রি সেই বাড়ীতে মারামারি করিত, চিৎকার করিত তখন হইতে মাঠটির নাম হয় পেত্নী তলা। এখন তাহা পেত্নী তলা নামেই পরিচিত।

বিন্দু সওদাগরের বিশ কাউন নৌকা

আমিও আমার নানার ঠায় হুনচি[১]। হে পরায় ৭০ বছর পূব্বে[২] হুনচি গল্পটা। হে[৩] তার মুরুব্বিদের মুহে হুনচিল যে তার মুরব্বিগ্যারে আমলে নয়া বাড়ীতে বিন্দু সওদাগার নামে এ্যাক সাইট্যাল[৪] সদাগর আচিল। তার টাকার সার আঐ নাঐ আচিল না। তার বানিজ্যের নাও আচিল গুনতির বাইরে।

একদিন তার মায় কয় বিন্দুরে আমারে তর নাও কয়হান[৫] ত্থাহালি না। ইয়া[৬] হুইন্যা বিন্দু সদাগর কয়, ক্যারা[৭] কয় আমার এত নাও আচে। মায় কয়, মাইনষের কাচে হুনি। বিন্দু হাইস্যা দিয়া কয়, মা মাইনষে তো আর মিছা কথা কয় না। তহন তার মায় কইল, তাইলে[৮] তুই আমারে তর নাও গুইন্যা ত্থাহাবি[৯]। বিন্দু সদাগর কয়, মা আমাগো বাড়ীর কাছে একটা সুমুদ্দর[১০] থাকলে তয়[১১] আমার সককল[১২] নাও ত্থাহান যাইত। এতো আর তুমার বাপের নায়ের মত ইটু ইটু[১৩] নাও না। আর তুমার বাপের নাও আছিল মুটেই ৫/৬শ। তুমার বাপেও এ্যাটা[১৪] সদাগর ত্যালাচুরাও এ্যাটা পক্কী[১৫]।

মার কয় থাইক[১৬] বিন্দু এত দুন্নাম ছুন্নামের কাম নাই তারা মুরুব্বি মানুষ, তারা হে পারে[১৭] চইল্যা গেছে, তুমি তাগো[১৮] বদনাম কইর না। আমি তুমার নাও দেখপার চাইনা।

তেমুনি বিন্দু তানগো[১৯] আরু দুন্নাম কল্লো। মায়ের মনে দুঃখ দিল।

১। শুনিয়াছি ২। পূর্বে ৩। সে ৪। প্রকাণ্ড ৫। কয়খান ৬। ইহা ৭। কে বা কাহারা ৮। তাহা হইলে ৯। দেখবি ১০। সমুদ্র ১১। তবে ১২। সকল ১৩। ছোট ছোট ১৪। একটা ১৫। পক্ষী ১৬। থাক ১৭। সে পারে ১৮। তাহাদের ১৯। তাহাদের

আর এ্যাকদিন বিন্দু সদা গরের মা কইচিল, বিন্দুরে, আমের দিন চইল্যা যায়। একদিনও পরান ভইর‍্যা দুধভাত খাইলাম না। তহনে বিন্দু সদাগর একটা ছোট মোট তালাপের সুমান চৌবাচ্চা বানাইয়া তার মইদ্দে দুধ ডাইল্যা[২০] আমগুলাইয়া দেয়। মায়রে কয় নাইম্যা ডুব পাইর‍্যা খাও। ইয়াত্তে[২১] মায়ের মনে ত্যোগ অয়[২২] কিরে ও আমারে জিদ্দি কইর‍্যা চৌবাচ্চায় আম দুধ দ্যা[২৩] নাওয়াইয়া খাওয়ায়। কিন্তুক মা তার মনের কথা গোপন কইর‍্যা চৌবাচ্চার মইদ্দে আম দুধ খাইবার নামে।

উদারে বিন্দুর বিশ কাউন[২৪] নায়ের পোরতেকটা[২৫] নায়ের এ্যাটা এ্যাটা[২৬] মাল্ল্যা আর এ্যাটা কইর‍্যা[২৭] বৈঠা নইয়া আস্‌পার হুকুম দিচে। তারা আসল। তাগো বৈঠা থুইতেই তিন খাদা[২৮] বুই[২৯] জুইড়া গেল।

তাগো[৩০] খাওয়া দাওয়ার পর অর মায়রে ডাক দ্যা আইন্যা[৩১] নায়ের মাল্লা মাঝি দ্যাখাইবো। এইট্যা[৩২] বিন্দু সদাগরের মনের আশা। কিন্তু বিন্দু সদাগরের মা সেই যে চৌবাচ্চায় নামচে আম দুধ খাইবার আর উঠে নাই সকলে যাইয়া দেখে বুড়ী ওপার চইল্যা গেছে।

ইয়ার[৩৩] ৬ মাসের মইদ্দে[৩৪] বিন্দু সদাগরের সকল নাও ডুইব্যা যায় একটা মাত্র ঝড়িতে[৩৫]। এক কান্তাবর্তী নদীতেই ডুবে ৫ কাউন নাও। হেই নদীতে চর পইর‍্যা নদী মইর‍্যা গছে। আইজও মানুষ যহন চাষ আবাদ করে তহন নাঙ্গলের[৩৬] ফালায় বাইঝ্যা উঠে পচা কাঠ, মইরচা পরা লুহা।

২০। ঢালিয়া ২১। ইহাতে ২২। হয় ২৩। দিয়া ২৪। এক কাল=২০×২০ ২৫। প্রত্যেকটা ২৬। একটা একটা ২৭। করিয়া ২৮। একখাদা ৩৩ ডিঃ=১ পাখি ১৬ পাখি=একখাদা ২৯। জমি ৩০। তাহাদের ৩১। আনিয়া ৩২। এইটা ৩৩। ইহার ৩৪। মধ্যে ৩৫। ঝড়ে ৩৬। লাঙ্গলের।

"বানিয়া জুরীর তমাল পুকুর"

বহুদিন আগের কতা[১]। বাইন্যা জুরী গাঁয় এক ছোট জমিদার আছিল। হে[২] তার মার চিতার উপর এক মঠ দেয়। রোজই হেই[৩] মঠে সন্ধার সুমায় বাত্তি দিত আর বেহানে ফুল দিত।

এমনি কয়হাক[৪] মাস যাওয়ার পর এক রাইতে হেই রাজা খুয়াপে দেখ্‌ল যে, তার মা তারে কইত্যাছে। আমি এইখানেই আছি। আমার নাওয়া ধুয়ার খুব অসুবিধা হইত্যাছে, তুই আমার মঠের কাচে এ্যাটা[৫] পুকুইর কাইটা দে।

পরদিন ঐ জমিদার তার আম্‌লা ফুইল্যাগো কইল, আমারে আমার মা খুয়াপ গাহাইচে তার নাওয়া ধুয়ার খুব অসুবিদা, ঐ মঠের কাচে[৬] এ্যাটা পুকুইর কাইট্যা দিব্যার কইচে।

ইয়া শুইন্যা[৭] সকল[৮] আমলা ফুইল্যাই কয়, মহারাজ আপনে সকালে পুকুইর কাটান। ইয়ার পরে হে[৯] ঐ মঠের কাছে খুব বড় এ্যাটা পুকুইর কাটাইয়া দিল।

সেই পুকুরের পানি একটা পাকা ডালিমের রোয়ার মত লাল ডগ্‌ ডগা অইল[১০]। হেই পুকুইরে ম্যালা মাছ ছাইড়্যা দিল। কত রুই, কত চিতল মাছ যে অইল কিন্যা তা মনের মত। কিন্তুক অই জমিদার নিজেও মাছ মাইরত না, কেওইরে মাইরব্যার ও দিত না। এই জন্যে মাছ গুইল্যা খুব বড় অইল। পুকুইরে যাইব্যার গেলে মাছ গইল্যা এ্যাটার পর এ্যাটা[১১] আইস্যা গতরে ডুস্‌ দিত। কেওই[১২] কুনদিন মারেনা কিন্যা হেইজন্যে[১৩] মাছেরা মানুষ দেইখ্যা বেশী ডরাইতো না। যুদি পুকুইরের পানিতে খই বা মুড়ি ছিট্যাইয়া দেওয়া যাইত তাইলে হেই[১৪] হগল তাম্বুর তাম্বুর মাছ ভাসান দ্যা উইঠ্যা

১। কথা ২। সে ৩। সেই ৪। কয়েক ৫। একটা ৬। নিকটে ৭। শুনিয়া ৮। সকলে ৯। সে ১০। হইল ১১। একটার ১২। কেহ ১৩। সেইজন্যে ১৪। সেই

খই মুড়ি খাইত। এই সব তামসা জমিদারও দেইখ্‌ত, পাড়ার লুকেও[১৫] দেইখ্‌ত।

একদিন ঐ পুকুরের পাড়ে এক দরবেশ আসিল। দরবেশ জমিদার বাবুর মন পরীক্ষ্যা[১৬] করবার জন্য একটা মাছ চাইল—আস্‌লে[১৭] দরবেশ মাছ আর মাংস তো দূরের কথা ভাতেই খায় না। সে ফল মূল ছাড়া কিছু খায় না। সেই মানুষটা আসলেই কামেল আউলিয়া আচিল[১৮]।

জমিদারকে সেই আউলিয়া কইচিল[১৯]। হ্যাখরে, আমার খাইব্যার সখ আইচে[২০]। আমারে ছোট মোট একটা মাছ দে। আমরা হ্যাশে হ্যাশে ঘুইর‍্যা বেড়াই। আমরা তগো[২১] দশজুনের খায়ুইয়া। জমিদার কয়, আমি ফকীর ফক্‌রা মানিনা। তুমাগো[২২] চাইয়া মাছের দাম আমার কাছে অনেক বেশী।

তহনে দরবেশ কয়, হ্যাখরে বাপুরে, তগো হিন্দু শাচ্‌তরেও তো কয় অতীত নাকি সাক্ক্যাত[২৩] নারায়ন সে কতা[২৪] ভুইল্যা গেছাও স্নুনার চান। তহনে জমিদার বাবু গইর্জ্জা উইঠ্যা কয়, এই ক্যারা কুথায় আচাস্‌ ব্যাটারে ইক্‌টু শিক্ক্যা[২৫] দিয়া দে—ব্যাটা আমারে নীতি শিখাইব্যার আসে।

তক্‌খন তক্‌খনই ২৫/৩০ জন পাইক বরকন্দাজ ছুইট্যা আইল নাঠি ছটা নইয়া[২৬]। ছোট মোট একটা তমাল গাছ আছিল কাছেই দরবেশ সাব সেই তমাল গাছ টান দ্যা উইঠ্যিয়া[২৭] খাড়াইল। কল[২৮], রাখ্‌ রাখ্‌ এতডি[২৯] মাইনষে বাইড়্যাবি আমার তো বাচুন লাগব, এইড্যার মইদ্দে[৩০] বাড়ি দে।

দরবেশ সাবের এই কেরামতি দেইখ্যা তহনে জমিদারও কাঁপে পাইকেরাও কাঁপে ; ঝড়ি আইস্যা গেল হগলের[৩১] গতরে। দরবেশ সাব নাঠিডা[৩২]

১৫। লোকেও ১৬। পরীক্ষা ১৭। আসলে ১৮। ছিল
১৯। কহিয়াছিল ২০। হইয়াছে ২১। তোদের ২২। তোমাদের চাইতে ২৩। সাক্ষাৎ ২৪। কথা ২৫। শিক্ষা ২৬। লইয়া
২৭। উঠাইয়া ২৮। কহিল ২৯। এতগুলি ৩০। মধ্যে
৩১। সকলের

তালাপে ফালাইয়া দিয়া কইল, পুকুইরে আর মাছ দেখ্‌পিনা[৩৩]। সত্য সত্যই ঐ পুকুইরে আর মাছ ভ্যাখা যাইত না। দরবেশ সাব তমাল গাছটা পুকুইরে ফালাইয়া[৩৪] দিচিল দেইহ্যা হেইদিন থ্যা মানুষে ঐ পুকুইরকে কইত তমাল পুকুইর।

জমিদার জাইল্যাগো[৩৫] দিয়া জাল বাওয়াইয়া দেখ্‌ল যে মাছ নাই। অনেকদিন পর এক সাধু আসল জমিদার বাড়ী। এ্যাহনে[৩৬] জমিদার সাধু সন্ন্যাসী দেখ্‌লে কিছুটা মানুষ বইল্যা জ্ঞান করে। ঐ সাধুরে জমিদার খুব যত্ন কল্লো। একদিন জমিদার সাধুর কাছে জোড় হাত কইর‍্যা কয় যে, বাবাজী, আমার এই পুকুইরের মাছ গেল কুথায়। সাধু হাইসা দিয়া কয়, বাবাজী সেই সুজা[৩৭] অইল্যা, মাছ থাকতে অইল্যানা। এ সাধুও একজন সিদ্ধ পুরুষ। ধ্যানের বলে হে জানছে যে, পূবের[৩৮] এমনি এমনি অইচিল[৩৯]।

তহনে সাধু বাবাজী একজন লোককে নিজের কাছে ডাক দিয়া তার চোহে[৪০] হাত বুলাইয়া দিয়া কৈল, তুমি ডুব দেও এই পুখুইরে। সে ডুব দিল বিকালে। বেলা তলাইয়া গেল সে আর উঠেনা। সক্কলে[৪১] তো মনে কল্লো, সে মারা গেছে। সাধু মহা ধ্যানে চোখ বুইজ্যা আছে। ই চোটে[৪২] আর ২৫/৩০ জন লাঠি লইয়া সাধুরে মারবার যাইবার সাহস পায় না।

সে লোকটা যহনে খলসীর মণ্ডলায় (বিল) যাইয়া উঠ্‌চে। তহন অনেক রাইত অইয়া গেছে। বিলের পারে উইঠ্যা সে আর কিছুই ঠিক পায়না। এ মস্ত বড় বিলের পাড়। সে ডুব দিল ছোট তালাপে এ্যাহন উঠে আইস্যা বিলে—মাছে সুরুং করছিল। বাইগ্যাজুরী থিক্যা খলসী ১৩ মাইল।

৩২। লাঠিটা ৩৩। দেখবিনা ৩৪। ফেলিয়া ৩৫। মৎস-জীবীদের ৩৬। এখন ৩৭। সোজা, ৩৮। পূর্বে ৩৯। হইয়াছিল ৪০। চোখে ৪১। সকলে ৪২। এবার

বাজার চকের পেত্না-পেত্নী

প্রসঙ্গ কথা

[যমুনার এক শাখা নদীর নাম কালি গঙ্গা। ইহা উত্তর আড়া (দৌলতপুর থানা), খলসী ঘিওর, জাবরা হইয়া প্রবাহিত হইয়া ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে। এখন ইহার অনেক অংশ শুকাইয়া গিয়াছে। পূর্বে এই নদী দিয়া নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ জাহাঙ্গীরনগর যাতায়াত করিতেন। কথিত আছে, নবাব মীর কাসিমও ঐ পথে অনেকবার মুর্শিদাবাদ হইতে জাহাঙ্গীরনগর যাতায়াত করিয়াছেন। নবাব মীর কাসিম খলিসা মৌজার বজরার চকে একটা কেল্লা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বজরার বিলে (কালি গঙ্গার সাথে এ বিলের সংযোগ ছিল) নবাবের নৌবহর নিরাপদে থাকিত। বজরার বিলে একবার নবাবের নৌকা ডুবিয়া যায়। নৌকায় নবাব ছিলেন না, উহাতে ছিল ধন রত্ন। উক্ত ঘটনা হইতেই এই গল্পের সূত্রপাত।

বজরার চক দৌলতপুর থানার অন্তর্গত খলসী ইউনিয়নে অবস্থিত, মহকুমা—মানিক গঞ্জ, জিলা—ঢাকা।]

জেবনেও[১৪] আর তর[১৫] ডাকাতি কইর‍্যা খাউন্ নাইগ্‌বো[১৬] না। এই পাগলই সেই ইলিম ফেরাজী, যাহাকে লোকে ইলিম ফেরেশতাও বলিত। পাগলা বলিল, দেখ আবেদ খাঁ, অনেক দিন পূর্বে বজরার বিলে, নবাব মীর কাসিমের একজন অনুচর সোনা রূপা বোঝাই দুইটা বজ্‌রা একটা বিলের মধ্যে ডুবাইয়া দেয়। লোভে পড়িয়া এই অনুচর নবাবের সাথে নিমকহারামী করে। তার স্ত্রী তার সঙ্গে ছিল। স্ত্রী তাকে লোভের পথে চালিত করে। পরে সে কর্মচারী ধরা পড়ে। তখন নবাবের হুকুমে সেই বিলের অন্যান্য বজরার কর্মচারী ও মাঝিমাল্লার সম্মুখে স্বামী-স্ত্রীর ফাঁসী হয়। সেই বজ্‌রার উপর মাটি পড়িয়া একটা ভিটার ন্যায় উঁচু হয়। এখানে একটা তাল গাছ উঠিয়াছে। ইলিম ফেরাজী আবেদ খাঁ ডাকাতকে প্রথমে খোদার নামে খরচ করিতে বলে। যদি সে তাহা না করে তবে বিপদে পড়িতে পারে।

আবেদ খাঁ ডাকাতের সর্দার। সে যে ধন রত্নের সন্ধান পাইয়াছে এই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। খোদার নামে খরচ করা তাহার কাছে ভাল মনে হইল না। সে মনে করিল, আমি আবেদ খাঁ ডাকাত। আমার নাম শুনিয়া কতজন ভয়ে অস্থির। আমার আবার বিপদ কি!

সংসারে আবেদ খাঁ আর তার স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন লোক নাই। যখন তাহারা তালগাছের নিকটে বাড়ী করে তখন কুমুড়িয়া গ্রামের লোকেরা মানা করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, আমরা কয়টি গ্রামের লোক ঐ তাল তলাকে ভয় করি। আর তুমি বাপু কোথা হইতে উড়িয়া আসিলে যে আমাদের কথা মান না। যাক, তোমার যাহা হইবার তাহাই হউক। আমাদের কথা যখন মান না, তখন আমাদের আর বলিবার আছে কি।

আবেদ খাঁ বলিয়াছিল যে, সে পদ্মার পাড়ের ডাকাত। তার কোন ভয় নাই। যমও তাহাকে খাতির করে। তাছাড়া কুমুড়িও তার আশপাশের গ্রামের লোক তো তালতলা দেখিয়া ভয় পাইবেই, এ সমস্ত গ্রামে তো আসলে কোন পুরুষ মানুষ নাই, সবই মেয়ে।

একদিন অন্ধকার রাত্রিতে আবেদ খাঁ তার স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া তালগাছের গোড়া খুঁদিতে গেল। কিছুক্ষণ খুঁদার পর পিছন হইতে সেই জটওয়ালা

১৫। তোর ১৬। খাইতে হইবে না।

পেত্‌না-পেতনী তাহাদের ঘাড় ধরিল। আর দেরী না করিয়া উহারা আবেদ আর তার স্ত্রীকে আছাড়ের পর আছাড় মারিতে মারিতে দফা শেষ করিল।

সেই কবে আবেদ খাঁ আর তার স্ত্রী মারা গেছে আজও তাহাদের ছায়া মূর্তি আগুনের কুণ্ড মাথায় করিয়া তাল গাছওয়ালা চকে উড়িয়া বেড়ায়। আজো মানুষ মনে করে যে ঐ পেত্‌না-পেত্‌নী আর কেহ নয়। নিশ্চয় তাহারা নবাব মীর কাসিমের সেই কর্মচারী আর তাহার স্ত্রী।

বহুরার মণ্ডলার সোনার নৌকা পবনের বৈঠা

ঠাকুরদার কাছে বইসা ছিলাম। নানা রকম গল্প উঠল উনি বহুরার মণ্ডলার[১] গল্পটা যে বল্লেন তার কিছু কিছু আমার মনে আছে।

উনি বল্লেন, তোরা আইজ কাল আইগলা মানুষের কথা ভুতুইর‍্যা গল্প বইল্যা উড়াইয়া দ্যাস। কিন্তু আমাগোর সময়ে রাইত নিশিতে চলার সময় আমরা যে সব ভয়ের জিনিষের ছামনে পড়চি তা তুরা যদি সে সব জিনিষের ছামনে পড়তি তগোর শরীরের রক্ত জইম্যা যাইত।

একদিন গান শুইন্যা অনেক রাইতের সময় বাড়ী ফিরত্যাছি। আমরা ছিলাম সাত জন। তাইতে আমাগোরে মনে ভয় একটু কমই আছিল।

যখন বিলের পাড়ের কাছে আইছি তখনে গতরের লোম কাটা দিয়া উইঠ্‌ল। গতর ছম্‌ছম্‌ কইরব্যার লাইগ্‌ল। এ বিলের সম্বন্ধে নানান রকম ভয়ের গল্প শুইন্যাছি ছোটকাল নাগাদ। আজ বুঝি তারই ছামনে পাইলাম। ঘোরতর অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। কিছুক্ষণ পরে বিলের মইধ্যে কিসের যুনি[২] ঝামুর ঝুমুর আওয়াজ পাই। আমাগোরে তহন চাইলে ডাইলে।

দেখি কি একটা চিক্কন ছিব নৌকা পবন গতিতে বিলের দিঘাদিঘ বাইচ খেইলতাছে একবার এ আগারিতে[৩] আসে আবার ও আগারিতে যায়। চক্‌চকা নৌকা, অন্ধকারের মধ্যেও একটা আগুনের র‍্যাখের[৪] মত দেখা যায়। বাইছা বা বৈঠা কিছুই দেখা যায় না। আমরা বুইঝলাম এই বুঝি সেই সোনার নৌকা পবনের বৈঠা।

কিছুকাল পরে দেখি নৌকাটা আমরা যে পারে আছিলাম সেই পারের কাছে চাইপ্যা আইসপ্যার লাগছে। আমরা ভয়ে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছি। এখনে নৌকা আমাগরে দিকে চাপে, আমাগো যদি লইয়া যায়, এই ভয় আইস্‌ল মনের মইধ্যে। এক সময় এই সোনার নৌকা পবনের বৈঠা মেহের মোল্লাকে নিয়া গেছে। তুমি যে পারে দাঁড়াইয়া আছাও সোনার নৌকা

১। বিলের ২। যেন ৩। বিলের দুই মাথাকে দুই আগারি বলে ৪। রেখার

পবনের বৈঠা যদি সেই পারে কিনারায় লাগায়, তা তুমি যত শক্তিমানই হও, ঐ নৌকায় তোমার একা একা আপছে যাইয়া হাইটা উঠন লাগব। তুমি শক্তি খাটাইয়া পারে দাঁড়াইয়া থাইকপ্যার পাইরব্যা না।

কিন্তু আমাগো মনে সে ভয় হইলেও আবার কিছুটা সাহসও আছিল। আমরা তো মেহের মোল্লার মত সোনার নৌকা পবনের বৈঠার কোন ক্ষতি করি নাই। সে যুনি গলায় কাপড় লইয়া নামাজ পরার প্রতিজ্ঞা কইর‍্যা বাসন পত্র নিয়া পরে একখান ফেরত দেয় নাই। শ্যাষ পর্যন্ত নৌকা পারে ভিড়ল না। পারের কাছে দিয়াই, এই ধর ৩০ হাত তফাৎ দিয়া বাইচ খেইলবার লাইগ্‌ল।

আমরা টায় টায় হাইটপ্যার লাইগলাম। কারো মুখে কথা নাই। দলের মধ্যে দুই একজন আছিল এ্যাকটু সাহসী। আসলে কামের বেলায় না পারুক কিন্তু গল্পের বেলায় ডাফিড়ুফ কইরত খুবই, আইজ তারা চুন্নী বিলাই— চাপ্‌—চুপ্‌ বল্লার টুপ্‌।

আমরা যখন পশ্চিম পার আইল্যাম তখন দেখি আর এক বিপদ। দেখি কি প্রকাণ্ড এক হাতী, দুই চোখ তার আগুনের তারার মত জ্বল জ্বল কইরত্যাছে, খালি ডাইনে বাঁয় শুড় নাড়াইত্যাছে। আমাগোর শরীরের রক্ত যুনি হিম হইয়া গেল। আমরা মইর‍্যা হইয়া দৌড় দিলাম। কিন্তু হাতীও আমাগো পাছে ছুটল। পরায় আমাগো ধর ধর করছে, এমন সময় চাইয়া দেখি ছামনের চক কে চক মশালে মশালে উইজালা হইয়া গেল। কত লোক লস্কর স্যাহা যাইবার লাইগ্‌ল। পাছেও বিপদ ছামনেও বিপদ। ছামনের ডাকাইতের দলের দিকেই আগাইয়া চইল্‌লাম। পাছে তখন যদিও হাতী মিলাইয়া গেছে, তাও বিলের দিকে আর যাইব্যার সাহস হইল না। যা থাকে কপালে, তেমুন মানুষের হাতে মরি। স্যাও দুইর‍্যাচারের কবলে আর ফির‍্যা যামু না। আইগিয়া যাইয়া দেখি ডাকাইতের দল না এটা, বর যাত্রীর দল। কাঁইপতে কাঁইপতে তো তাগোর কাছে আইগিয়া গেলাম। তারা আমাগো দুরবস্থার কথা শুইন্যা কয়, ও পথ ধরছিলা ক্যান? এতো জানা কথাই যে ঐ জাগাটা খারাপ। মইরতে মইরতে ধাণ্ড বাগুর উপর জানটা লইয়া বাড়ী ফিরলাম।

কয়েকদিন পরে দেখি শ্যামাপ্রসাদ কাহা[৫] শিন্নীর চাইল গুর লইয়া চলছে বহরার বিলের পারে। কাহা যে এখন মুসলমানের শিন্নীতে গুড় দেও আগে তো তা দিতানা, আমি তারে এই কথা কইলাম। শ্যামা কাহা কয়, আরে বাপুরে, ঐ যে সেদিন বিলের পারে শাস্তি অইলা ও তো আমারি জন্যে। একবার আমি গলায় কাপড় লইয়া জোর হাত কইর‍্যা সোনার নৌকা পবনের বৈঠার কাছে কিছু বাসন পত্রের আর্জি জানাই। নৌকা আমার কাকার আর্জির পরের দিন বাসন পত্র ডাঁঙ্গায় উইঠিয়া দেয়। কিন্তু মানুষে আমারে ভয় দেখায় যে, শ্যামা কাহা তুমি ঐ সব বাসন আইনো না। যদি এক আধটা হারানি যায়, তাইলে আবার মেহের মোল্লার দশা হইব্যার পারে। তহনে আমি ভয় পাইয়া ঐ সব বাসন আনি নাই। সারা দিন বাসন বিলের পারে পইড্যা রইল। আমি খামাকখাম সোনার নৌকা পবনের বৈঠারে কষ্ট দিছিলাম। তাই সেদিন রাত্রিতে আমারেও এক প্যাছ দ্যাহাইয়া দিল। রাইতেই আমারে স্বপনে দ্যাখাইল বছর বছর ঐ বিলের পারের শিন্নীতে চাইল গুড় দিবি।

এর পরে দেখছি শ্যামা কাহা যতদিন বাইচ্যা আছিল ততদিন সে ঐ বিলের পারের শিন্নীতে চাইল গুড় দিত।

৫। কাকা

বৈন্যার বিলের দাতাল

দাদা মিয়া বৈন্যার বিলে খাড়ায়া[১] খাড়ায়া ঘুড়া[২] ঝাপাইত্যাছে[৩]। ঘুড়াডা খালি[৪] লড়্‌কে করবর করে। একখানে ঠান্‌ঠাহয়ে খাড়ায়া থাহে[৫] না। দাদা মিয়া ঘুড়াকে কয়, এত যদি লড়কস্‌ তাইলে[৬] কিছু গ্যাহায়া দেমানে। ইস্‌মায় ঘুড়ার ছ্যামায় কি যুনি[৭] একটা ভুর্‌ ভুর্‌ কইর‍্যা পানির মধ্যি গুলতায়[৮] উঠ্‌চে। উইয়্যা[৯] দেইখ্যা দাদা মিঞা লাফায়া ঘুড়ায় উঠ্‌চে। যে জাগায় সে খাড়ায়া আচিল ঐ জাগাডায় মাত্রই মাজা[১০] পানি। বিলের সক্কল জাগার থিক্যা ঐ জাগাডায় পানি বেশী। কেওই[১১] সেই জাগাডায় নাইম্‌ব্যার সাবাস পাইত না। কিন্তুক দাদা মিয়ার খুব বেশী সাবাস্‌ আছিল। তাইত সে ঐ জাগার কাছে খাড়ায়া ঘুড়া ঝাপাবার লাগ্‌ছিল[১২]।

দাদা মিয়া যহনে[১৩] ঘুড়ায় উঠ্‌ছে তহন ঘুড়া ডরায়া[১৪] লাফ মারছে। তান্‌ তো[১৫] ঘুড়ার পিঠ থিক্যা পইর‍্যা[১৬] গেল কিন্তুক তানের[১৭] হাতটা ঘুড়ার ল্যাগামের যোতের[১৮] সাথে জরায়া[১৯] গেছে। উদারে[২০] তার পায়ের নোগ[২১] কামড়ায়া[২২] ধরচে সেই ভুর ভুইর‍্যা সক্‌সে[২৩]। এদারে[২৪] ঘুড়াডা জানের ভয়ে ঝাপট্‌ কইর‍্যা ডাঙ্গার পিলে[২৫] নুড়[২৬] মারছে। ঘুড়ার টানের চোটে দাদা মিয়ার নোগ দুইড্যা[২৭] ছির‍্যা[২৮] নইল সক্‌সের মুকে[২৯]। ডাঙ্গায় উইড্যা গ্যাখে রক্ত আর থাম্‌তি চায় না। তাড়াতাড়ি বাড়্‌তে[৩০] আইস্যা নানান[৩১] গাছ গাছড়ার ওষুইধ দিতে দিতে রক্ত বন্ধ তায়[৩২]।

১। দাঁড়াইয়া ২। ঘোড়া ৩। গা ধুইয়া দিতেছে ৪। কেবল ৫। থাকে ৬। তাহা হইলে ৭। কি যেন ৮। আলোড়ন ৯। উহা ১০। কোমর ১১। কেহই ১২। ঘোড়ার গা ধুইয়া দিতেছিল ১৩। যখন ১৪। ভয় পাইয়া ১৫। তিনি তো ১৬। পড়িয়া ১৭। তাহার ১৮। লাগামের রশির ১৯। জড়াইয়া ২০। ওদিকে ২১। আঙ্গুল ২২। কামড়াইয়া ২৩। জল জন্তুতে ২৪। এদিকে ২৫। দিকে ২৬। দৌড় ২৭। দুইটা ২৮। ছিঁড়িয়া ২৯। মুখে ৩০। বাড়ীতে ৩১। নানা ৩২। রক্ত

এক মাস ভুগার পর দাদা মিয়ার পাও সারে। এক রাত্রিতে বৈন্তার বিলের সেই দানুতে দাদা মিয়াকে খুয়াপে ছাখায়, ছাখরে আমি তর কাছে বড় অন্যায় করছি। যাইক্ যা হয়া[৩৩] গেছে হয়াই গেছে। তার জন্যি আফ্‌সোস কইর‍্যা আর কি করবি। আমি তকে একটা জিনিষ দিয়া দেমানে[৩৪] তুই ছ্যামা[৩৫] শনিবার দিন গতে রাইত নিশির আমুলে[৩৬] বিলের পাড়ে মট্‌মইট্যার[৩৭] ঝোপের কাছে চইল্যা আস্‌পি। তুই ডরাইস্[৩৮] না আরে দেইখ্যা আমি আর তর কুন অনিষ্টি[৩৯] করমু না।

দাদা মিয়া দানুর কথামত বিলের পারে যায়। যায়া ছাহে মট্‌মইট্যার ঝোপের কাছে একটা ভুচ্‌রা খ্যাতার[৪০] মত শুড়য়ালা একটা জন্তু। আর একটা মর্দ্দকে প্যাচায়া লিয়া[৪১] পানিতে লামায়া ফালাবার মতলব করচে। মর্দ্দর গতর ভরা ভুল-ভুইলা পশম। জুস্‌নায়[৪২] পষ্ট ছাখা যায়। মর্দ্দটা কম জোরদার না, ছাও ভুচরা খ্যাতাকে ডাঙ্গার দিক টাইন্যা উইঠব্যার যুগার কইরত'ছে। কিন্তক শুড়য়ালাডা বহুত শুড় ছা জরায়া ধইর‍্যা মর্দ্দকে কাবু কইর‍্যা ফালাইচে। কতক্ষুণ ধস্তাধস্তির পর মর্দ্দই কিছুডা কাবু হয়া গেল। দানু তারে আটু পানিতে নামায়া ফালাইল। ওরে মর্দ্দ যে চেরেৎকার, জানের মায়া কার না আছে।

দাদা মিয়া কইচে আমার হাতে আচিল ধারাল দাও[৪৩]। আমি নুড়ায়া[৪৪] গেলাম। আমি ভাইবল্যাম, ইডা অইল[৪৫] ডাঙ্গার জিনিষ, ইডা ছাউ দুই-র‍্যাচার[৪৬] যাই ক্যান হোউক্ না পানিতে ডুইব্যা মরার হাত থিক্যা ইয়্যারে[৪৭] বাঁচায়া[৪৮] দেই। যাইয়্যাই আমি দাও দিয়া উইয়্যার গতরের উইপ্যার থিক্যা শুইড়্যার মুড় কাইট্যা দিবার লাগ্‌চি। ইস্লুমায় দেহি পশময়ালা সে মর্দ্দ নাই। শত্‌কে শত্‌শুড় আইস্যা আমারে প্যাচায়া ফালাইচে। তখন আমার দম বন্ধ হইয়া যাওয়ার যো। ইস্লুমায় আমার ছ্যামায় খাড়ায়া খল

৩৩। হইয়া গিয়াছে ৩৪। দিব ৩৫। সামনে ৩৬। গভীর রাত্রিতে ৩৭। এক প্রকার উদ্ভিদ ৩৮। ভয় পাইওনা ৩৯। অনিষ্ট ৪০। কাঁথার ৪১। লইয়া ৪২। জ্যোৎস্নায় ৪৩। দা ৪৪। দৌড়াইয়া ৪৫। হইল ৪৬। দুরাচার ৪৭। ইহাকে ৪৮। বাঁচাইয়া

খলায়া হাইস্ত্যাছে ৬/৭ হাত নম্বা এক মর্দ্দ। তার মুখ স্থা হাতীর দাঁতের মত দুই দাঁত বাইরাইয়া নইচে[৪৯]। সে কয়. স্থাখ্ পানির আমি দানু, ডাঙ্গায় আমি দাঁতাল। আবার এক সুমায় দুই ছুইর‍্যাত একবারেই ধইরতে পারি। তরে একটু পরীক্ষা কইর‍্যা দেইখল্যাম যে পরের ব্যাকরে[৫০] তুই নিজের জানের ভয় না কইর‍্যা আইগিয়া আসোস্, দর্ তুই এই লুহার ডাণ্ডাডা নি, ইডা[৫১] সাথে থাইকলে তর সাথে আর কেওই কুইলিব্যার[৫২] পাইরবো না। বাপুরে, আমার বাপে কইচে, বাপের হাতের সেই লুহার ডাণ্ডা নয়া একদিন রাইত দুইশ্যারের কালে বৈশ্যার চরের উপর স্থা[৫৩] আইসত্যাছি এমুন সুমায় সেই দাঁতাল আমার পাছ লাগল। খালি পাছ পাছ আসেই। পাছ পিনে চায়া দেহি[৫৪] মস্ত বড় মর্দ্দ, মুখের দুই মুর দুই দাঁত ঝুইলত্যাছে। ভয়ও করে, ইক্টু পর খুইড়্যা খাড়ায়[৫৫] ডাণ্ডা স্থাখাইল্যাম, দাঁতাল খল্ খলায়া হাইসা স্থা[৫৬] কয়, বাপের কাছ্থ্যা[৫৭] জিনিষটা রাইখ্যা দিচাস্, বেশ ভাল করচাস্। যা আমি তগ্যার অনিষ্টি করুম[৫৮] না।

৪৯। রহিয়াছে ৫০। বিপদে ৫১। এটা ৫২। কুলাইতে
৫৩। উপর দিয়া ৫৪। দেখি ৫৫। দাঁড়াইয়া ৫৬। হাসিয়া দিয়া
৫৭। কাছ থেকে ৫৮। করিব না।

মালাদির চরের কলেরার ছুল

[বাঘুটিয়া ইউনিয়নের মালাদির চর দৌলতপুর থানার অন্তর্গত। মহকুমা —মানিকগঞ্জ, জিলা—ঢাকা। এটা যমুনা নদীর চর। ইহার তিন দিক দিয়া যমুনা নদী প্রবাহিত। এই চর সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত জায়গা জমি লইয়া কৃষাণদের ভিতর বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। এখনও মাঝে মাঝে চরের জমি লইয়া বড় বড় ফৌজদারী হয় ফলে বহু লোক প্রাণ হারায়।]

একবার মালাদির চরে খুব বড় এক কাইজ্যা হয়। দুই পক্ষে পরায় হাজার পাঁচেক লোক ঐ কাইজায় যোগ দ্যায়। এক পক্ষ পরায়ই হারার যো হয়। তাই রাত্রে তারা বুদ্ধি করে যে আরু বেশী কইর‍্যা লোক যুগার করুন লাগ্‌বো। তারা সেই রাইত ভরেই তিন জন লোক পাঠায় নাইট্যা বাড়ীর চরে। সেখান থিক্যা লোক নিয়া আইসা পরের দিন কাইজ্যা কইর্‌বো।

মরা যমুনা পার হইয়া ওপার গেলেই শত্রুগো গেরাম। সেই গেরামের মধ্যে দিয়াই যাউন লাগ্‌ব। আর কুন পথ নাই। তারা তিন জন তিনট্যা ফালা লইয়া চইল্ল।

চরের শ্যাষ সীমানায় মরা যমুনার পাড়ে অনেক গুইল্যা ঝাই ঝোপ আছে। সেই ঝাই ঝোপ গুইল্যার কাছে আইস্‌লে তারা দ্যাখে যে একটা শিয়াল কয়েকটা বাচ্চা লইয়া তাগো ছামনে দ্যা বাও মূর্‌ যায়। মাইন্‌ষে কয়, শিয়াল বাও হাতি হইলে যাত্রা খুব ভাল হয়; কিন্তু তারা সে কথা মাইন্‌ল না। তাগো হাতে ঝক্‌ঝকা ফালা, ওগো মাথাও খুব গরম, আগের দিন ভর কাইজ্যা করছে—তাগো মাথায় খুন চইর‍্যা রইচে। তিন জন এক সমানে ফালা ফেইক্যা দিল তিনও ফালাই যাইয়া শিয়ালের গতরে ঘচ্‌ কইর‍্যা গাইর‍্যা পইল। শিয়াল মইর‍্যা গেল। বাচ্চা কয়ডারে তারা বাইড়িয়া ধইরিয়া মাইর‍্যা ফালাইলো।

ওপার যাইয়া তারা শত্রুগো গেরামের শ্যাষ মাথায় গেছে। গেরামের শ্যাষ মাথায় একটা দুইট্যা ছেড়া বাড়ী আছে। উয়ার এক বাড়ীর কাছ দ্যাই তাগো পথ। রাইত হইছে অনেক কেওই চ্যাতন নাই। কিন্তু ঐ বড়ই

গাইছা এক ঘরয়ালা বাড়ীর দোপ স্থা যাওয়ার সময় তারা সেই ঘরে গুণ গুণ আওজ পায়। তারা ঘরের ব্যাড়ার ফাঁক স্থা চাইয়্যা স্থাখে এক বুড়ী তছপি হাতে লইয়া একটা বাচ্চার সিতানে বইস্থা আল্লাহু আল্লাহু কইর্ত্যাছে। তারা বুড়ীরে চিন্‌ল। এই বুড়ী কাজেম সর্দারের মা। কাজেম সর্দার তাগো বড় শত্রু। বড়ী ফকিন্নী মতে এই বাড়ীতে একলা থাকে আর যপতপ করে। বুড়ী অনেক অনেক ব্যামোর চেষ্টা জানে। কাজেম সর্দারের ছোট ছেইল্যার কলেরা হইছে। তাই সে তার মার কাছে ছেইল্যারে দিয়া গেছে।

তিন জনে তিনট্যা মইষের মত একযোগে একটা হুইরকা স্থা ঘরের দরজা ভাইঙ্গা ঘরে ঢুইক্যা বুড়ীরে কয়. তর ছেইল্যা আমাগো শত্রু। আজ তর ছামনে তর নাতির চেষ্টা কইর‍্যা যাই। স্থাখ কি বাহারের স্থাখা যায়। বোধ করি যে ইয়াতে তর ছেইল্যার ছেলে একটু চিট্‌মিট্‌ কইরব্যার পারে।

ঘরে যে বাতি আছে ইয়ার আলোতে ভালো কইর‍্যা দেইখপ্যার পারবি হানে না। রাখ্‌, একটা নতুন বাতি জ্বালাইর‍্যা লই। এই কইয়াই তারা করল কি, কুপির কেরোসিন তেল বুড়ির মাথায় ঢাইল্যা স্থা আগুন ধরাইয়্যা দিল। আর সেই সময়ই আর এক জন তার ফালা ঘচ্‌ কইর‍্যা শিশুটার প্যাটে বসাইয়া দিয়া কইয়া উইঠ্‌ল, স্থাখ বুড়ী, তর নাতির কেমন ভাল চেষ্টা কইর‍্যা দিলাম। আর বারে বারে দাস্ত হইব্যার পারব না। এক ঠ্যালায় সব গলিজ বাইর কইর‍্যা দিলাম।

বুড়ী কয় আর দাপায়, স্থাখরে বাপুরে যা কল্লি ভালই কল্লি। কিন্তু সব ব্যারামেরই রূপ আছে। ব্যারামের ছুল বোধ করি আইজ পর্য্যন্ত স্থাখস্‌ নাই। হায়ূস কইর‍্যা কলেরা ঘারে কইর‍্যা লইয়া গেলি।

ঐ বাড়ী থিক্যা বাইরিয়া ওরা পথে নাম্‌চে। এমন সময় ওরা স্থাখে যে কয়াকজন লোক পথ স্থা অগো দিকে আইস্‌ত্যাছে। ওরা স্থাখে এই গেরামের লোক। ওগো পাইলে তো ছাইড়ব না। ওরা দৌড় দিছে। তারাও ওগো পাছ পাছ দৌড়াইল। কিসের নাইট্যা বাড়ী কে যায় এখন, জান লইয়া টানাটানি। ওরা মরা যমুনার দিকে দৌড়াইয়া চইল। সে লোক গুইল্যা ওগো পাছ পাছ আইস্‌প্যার লাইগ্‌ল। যখন ওরা মরা যমুনা পার হইয়া ওপার গেল তখন স্থাখে নদীর অপর পারে তিন জন দাঁড়াইয়্যা রইছে। তারা

পুরুষ না, মেয়ে মানুষ। চান্দের আলোতে স্থাখা যায় না। কাপড় তাগো ধলা ধব ধবা কিন্তু মানুষ তারা কালো স্ত্রী। তখন তারা কয়, কিরে, আরতো এপার আইস্‌প্যার পারলিনা, আয়, এপার আয়, একাকটারে ফালায় গাঁথ। ইকথার উত্তরে তারা ওপরি থ্যা শুধু বুড়ী নোগ স্থাখাইয়্যা দিল।

ওরা তখন বাড়ীর পথ ধরার জন্ম কেবলই ঘুইর্যা খাড়াইচে আর অমনি দেখ্‌ল যে ওপারের তিন জন মেয়ের মত আরু তিন জন মেয়ে তাগো ঘাড়ের কাছে দাঁড়াইয়াছে। বুড়ী নোগ নাচায় আর কয়, ফালায়ালার ব্যাটা ফালায়ালা, কয়ডা ফালা বানাইচাস, আমাগো গতরে গোস্ত নাই, আমরা কলেরা, আমাগো ভাপেসেই আমাগো গোস্ত পানি হইয়া গইল্যা গেছে। ফালা বসাবি কোন জাগায়। এগুলি লুহার হাডডী। ইয়াতে তগো কালা বইস্‌পোনা। একটা ঘুইরিস্থা তুক্কা স্থা তগো ফালা তগো ঘুইড়িয়া দিয়া দিমু। পলাস্‌না। কোন জাগা স্থা পলাবি। আমরা তো ওপার আছিল্যাম, আমাগো এপারে আন্‌লি ক্যানে? ওরা দেখলো সত্যি তাগো গতরে মাংসের ল্যাসপ্যাস নাই। সারা শরীরে শুধু হাডডী; পাঁচ হাত লম্বা নরকঙ্কাল যেন পাক পাতিলের কালির মত কালা চামরা স্থা ছাওয়া। দুই হাত নাচাইয়া নাচাইয়া অগো দিকে দুই হাতের দুই বুড়ী নোগ নাচায় আর কয়, পলাস্ না। কোন জাগাস্থা পলাবি।

এই রকম অবস্থায় তারা যে কোন দিকে দৌড় দিবো সে দিশা নাই। তাগো আত্মা যেন খাঁচা ছাড়া। শ্যাষে চোখ মুখ বুইজ্যা তারা পশ্চিম দিকে দৌড় দিল। তাগো বাড়ী মরা যমুনার দক্ষিণ দিকে কিছু দূর আইস্থা তারা একটা ঝাই ঝোপের ভিত্‌রে গুজ গুজিয়া ঢুইক্যা পইড়ল। সে জাগাও স্থাখে একটা খোলটে ঐ তিন মূর্তি বুড়ী নোগ নাচায় আর কয়, পলাস্‌না। কুন জাগা স্থা পলাবি। সেখান থ্যা ঘুইর‍্যা তারা পূব দিগে, কাশবনের দিগে দৌড় দিল। সেই ঝোপের ভিতরে বইস্থা তারা কিছুটা সময় বিশ্রাম কইর্‌ল। তারা মনে করচে যে, যমের মূর্তি তাগো ছাইর‍্যা গেছে। কিন্তু যখনই তারা কাশবন থ্যা মাথা বাইর কর্‌ছে তখনই স্থাখে যে কাশ বনের ছামনে সেই তিন মূর্তি। তারা বাইরে আইলো না। বনের ভিতর স্থা গুঁজি স্থা ম্যালা দিল। যাইতে যাইতে পরায় আধ মাইল খানি জাগা যাইয়া সারছে এমন সময় তাগো

ছামনে মানুষের গলার ফিস্ ফাস্ আওয়াজ পাওয়া যায়। তারা মানুষের ছামনে যাইব্যার সাহস পাইল না, কি জানি যদিই শত্রুরা পলাইয়া থাইক্যা থাকে। তারা আবার যমুনার দিকে দৌড়াইল। তখন রাইত ধল পুহা দিছে। দৌড়াইতে দৌড়াইতে তারা নদীর পাড়ের কাছে গেল। এবার তারা নদীর পাড় ধইর‍্যা চল্ল। কিছুক্ষণ পর কয়াকটা বাড়ী পাইল। তিন জন যাইয়া ঐ বাড়ীতে উঠ্‌চে তেই অগো পাছ পাছ যাইয়া সেই বাড়ীতে উঠ্‌ল সেই তিনটা কলেরার ছুল। ঐ বাড়ীতে দশ জন মানুষ তার মইধ্যে তদ্‌-ঘড়িক্কেই চাইর জনের একটা কি দুইট্যা দাস্ত আর বার দুই বমি হওয়ার পর চাইর জনই শ্যাষ। উয়া দেইখ্যা ডরাইয়া ওরা আর এক বাড়ী গেল। ওরা যাওয়ার সাথে সথেই ঐ যে তিন কালা কঙ্কাল কলেরার ছুল তারাও যাইয়া সেই বাইড়তে উঠ্‌ল। তখন তখনই সে বাড়ীর দুই জন মানুষ মারা গেল।

ভয়ের চোটে ওরা সে বাড়ী থ্যা নাইম্যা দৌড় দিল। ই সুমায় সেই তিন কঙ্কাল অগো পাছে পাছে ধাওয়া কইরল। তারা কয়, দেখলি ব্যাটারা আমাগো ছুয়ায় কি হয় না হয়। আয় দেখি এখন তগো একটু দুইর‍্যা দেই, স্থাখ কেমন পুইরাতন তামসা। ফুইট্যার ব্যাটা ফুইট্যারা ফালা স্থা খাওয়া স্থা সব কলেরা সারাইয়া স্থাস্! এখন দৌড়াস্ ক্যানে, যাবি কয়?

উয়ারা এই কওয়ার সাথে সাথে লোক তিন জন তাগো পাছে এমনই আওয়াজ শুন্‌ল যে তাতে তাগো জ্ঞান হারানের উপক্রম হইত্যাছে। এই আওয়াজ কলেরা রোগীর দাস্ত হওয়ার আওয়াজ। এত্ত জোরে আওয়াজ হইল যে পরায় পোয়া মাইল দূর থ্যা শুনা যায়। আরো কিছু দূর দৌড়াইয়া যাইয়া তিন জনের দুই জন দাপাইয়া পইড়্যা গেল। একজন দৌড়াইয়া বাড়ী চইল্যা গেল। পথে যে দুইজন পইড়্যা রইল তাগো একটা কইর‍্যা দাস্ত আর একটা কইর‍্যা বমি হইছে। ঐ দাস্তের আওয়াজ পাইয়া পরায় শতাবিধি লোক ঝাইঝোপের ভিতর থিকা বাহিরিয়া আইল। তখন ফজর হইয়া গেছে। ঐ দলের মধ্যেই কাজেম সর্দার ছিল। সে কয়াক শ লোক লইয়া এ ঝাই ঝোপের কাছে তাগো অন্য লোকের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। এখনে কাজেম সর্দার কয়, খবরদার তুমুরা কেউ গো কিছু কইওনা। হাজার শত্রু হউক্,

অন্তিম কালে আর শক্রতা নাই। এক জন সর্দার গামছা ভিজিয়া মরা যমুনার থ্যা পানি আন্‌ল। কাজেম সর্দার সেই পানি ঐ দুই জন রোগীকে খাওয়াইল। ইয়ার একটু পরই তারা দুই জন চোখ বুইজল। সেবার আর কাইজ্যা হইল না। কলেরা লাইগ্যা গেল মালাদির চরে। সেইদিনই ও গেরামে লোক মরে সাত জন। লোকটা দৌড়াইয়া বাড়ী আসল সেও কয়েকদিন পর কলেরায় মারা যায়। গেরামের বলু ফকির কয়েক রাইত ধামাইল করার পর জান্‌ল যে, সেই যে জাগাডায় ওরা শিয়াল আর তার বাচ্চা মারচিল সেই জাগায় শিরণী কল্লে সে ব্যারাম যাইবো। আইজও শিয়াল মারা ঝাই ঝোপের কাছে শিরণী হয়। কলেরার ধুম দেখলেই চরের লোকে সেই জাগায় গাওয়ালী শিরণী করে।

মান্দারতার বটগাছের চাইর ভদ্দলোক

[ঘিয়র থানা হইতে দৌলতপুর থানা পর্য্যন্ত যে পথ চলিয়া গিয়াছে উহার প্রায় মাঝখানে মান্দারতা নামে এক গ্রাম আছে। সেই গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে একটি পাঠশালা আছে। পাঠশালার পাশেই এই বটগাছ। এটা একটা নির্জন স্থান। এই বটগাছের অনতিদূরে (পশ্চিমে) পুরঘাটা নামে এক ছোট বিল রহিয়াছে। এই বিলের পাড়েই শ্মশান ঘাট, সেইজন্য বিলের নাম হইয়াছে পুরঘাটা। এই বিল ও বটগাছ লোকালয় হইতে দূরে অবস্থিত। এখানকার ভয়ের গল্প বহুকাল ধরিয়া লোক মুখে প্রচলিত। এই স্থান চক্ মিরপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত। থানা দৌলতপুর, মহকুমা—মানিকগঞ্জ, জিলা ঢাকা।]

আমাগো[1] বুদ্ধি হওয়ার পর থিক্যাই[2] আমরা পুরঘাটার ভয়ের গল্প শুইন্যা আইস্‌ত্যাছি। কত বা হাত্তীর গল্প শুন্‌লাম, কত বা বিলাইর গল্প শুন্‌লাম আরু কত কিছুর গল্প শুন্‌চি এই পুরঘাটার তার কতক মনে আছে কতক আইজ আর মনে নাই। একবার এক গাড়ীয়ালা (ঘুড়ার গাড়ী আলা) কেমুন কইর‍্যা যে ডরাইছিল ঐ বটগাছটার নীচে সেই গল্পটা কই।

গাড়ীয়ালার বাড়ী নাগরপুর। সে নাগরপুর থ্যা[3] এক খ্যাপ ধইর‍্যা ঘিয়র গেছিল। খ্যাপের ভরসায় সে ঘিয়র ঘাটে অনেকক্ষুণ দেরী করে। কিছুতেই আর কুন খ্যাপ পাওয়া গেল না। ও দিকেও বেলা ডুইব্যা গেল। তাও কুন খ্যাপ না পাইয়্যা সন্ধ্যা বইয়া যাওয়ার পর সে বাড়ী রওনা দিল। পথে চলার সময় দুই চাইর জন লোকের আওয়াজ পাইলেই সে গাড়ী থামায়। মনে মনে ভাবে, এই বুঝি খ্যাপ পাওয়া গেল। যাইক কায়দা হইছে—তেমুন নিজের খাওয়া আর ঘুড়ার খাওয়ার দামটা পাওয়া যাইব্যানে। একটু পরেই গ্যাখে লোকগুইল্যা তার গাড়ী ছাড়াইয়া হাইট্যা চইলা যায় তারে আর কিছু জিজ্ঞাস করে না। সে আবার গাড়ী খ্যাদায়। কিন্তু আসল কাজের

১। আমাদের ২। হইতেই ৩। হইতে

বেলায় ঠন্ঠনা। ক্যাও তার গাড়ীতে চড়ে না। এই মতন চইল্‌তে চইল্‌তে সে যখন মান্দারতার বটগাছের কাছে আইছে তখন সে স্থাখে সাদা ধবধবা কাপড় চোপড় পড়া চাইরজন ভদ্দলোক ঐ গাছটা ছাইড়্যা একটু দূরে ধুয়া ফট্‌ফটা জাগায় খাড়াইয়া রইচে। তারা হাত স্থা এসারা করার সাথে সাথে গাড়ীয়ালা মনের আনন্দে গাড়ী থামাইল। গাড়ী থামাইলেই তারা মচ্‌ মচাইয়্যা গাড়ীতে উইঠ্যা বইল। ভদ্দলোক মানুষ তো! দেমাকের চোটে এরা আদতেই বেশী কথাবার্তা কয় না। কেবল ইসারা পিসারায় সাইর‍্যা স্থায়। তারা শুধু ইসারা কইর‍্যা ছ্যামামুখী স্থাখাইয়া দিল। গাড়ীয়ালাও মনে কইল্ল ভদ্রলোকের সাথে আর দাম-দস্তর ঠিক কইর্‌বো কি। এরা তো আর কুন দিন মানুষ ঠগাইবো না। গাড়ীয়ালা খুব জোরে গাড়ী হাঁকাইল। এমুন ভাল একটা খ্যাপ পাইছে তার মনে ফূর্তিতে আর আটে না। এতক্ষুণ সে একলা যাইব্যার লাগছিল আর মনের মধ্যে কিছুটা ভয় ভয় আছিল। পথটা যুদিও জুসনায় খ-খ কইরত্যাছে তাও এত রাইতে এতখানি পথ যাইতে কার না ভয় হয়।

একটু পরে বাতাস থাইম্যা গেল। সে ঐ পুরঘাটার পাড় স্থা যাইব্যার লাগ্‌চে। শুধু আঁইস্‌ট্যা গন্ধ কয়। গাড়ীয়ালা ভাবে যে হয়তো এই বিলের কোন মাছ পইচ্যা টানে পইড়্যা রইচে তাইতে এত গন্ধ করে। যাইতে যাইতে সে এক গ্রামের ভিতর ঢুইক্যা পইল। পথটা এই গ্রামের ভিতর স্থাই গ্যাছে। তখনও পঁচা মাছের গন্ধ পায়; সে মনে মনে কয়, আইজ পরায় একটা মাস ধইর‍্যা মাছের খ্যাপ্‌ দেইন্যা, তাও যে আইশ্‌ট্যা গন্ধ পাই। এখন তো বিলের পাড়ও ছাড়াইয়া আইল্যাম পচা মাছ থাক্‌পো কোন জাগায়, তাতে কইর‍্যা গাড়ীতে উইঠিল্যাম ধোব্‌ দুরস্ত ভদ্দলোক, ইয়াগো সাথে কি সুগন্ধ ছাড়া কুন কালে দুর্গন্ধ থাকপার পারে। হয়তো পাড়ার বৌঝিরা কুন বাড়ীর পাশে আইশট্যা ফালাইতে পারে। যাইতে যাইতে গাড়ী এক চকের মধ্যে দিয়া যাইব্যার লাইগ্‌লো তখনও আইস্‌ট্যা গন্ধ। তখন গাড়ীয়ালা মুনে মুনে কয়, ধুর্‌ আমারই নাকের দোষ আর মনের দোষ। ভদ্দলোকের গায়ের দোষ হইব্যারই পারেনা।

দেইখ্‌তে দেইখ্‌তে গাড়ীটা তিরছা কুইষ্ট্যার (নাগরপুর থানার তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিম কোণে) জটাজুট বুইড়া বট গাছটার কাছে আইস্যা

পড়ছে। এমন সময় ভদ্দলোকেরা গাড়ী থামানের জন্য গাড়ীতে একটা দুইটা চওড় দিল। গাড়ীয়ালা গাড়ী থামাইলে তারা ঐ বট গাছের গোরে গেল যেন তারা প্রস্রাব ফিরব্যার বইল। বট গাছের নীচ থিক্যা ফিরা আইসা আবার তারা গাড়ীতে চইড়্যা বইস্‌ল। যে পিলে থিক্যা আইচে সেই পিলে যাওয়ার জন্য তাদের একজন হাত ইসারা কইল্ল। গাড়ীয়ালা কয়, হ্যাখেন হুজুররা, এই যে রাইত ভইরা খাটাইত্যাছেন এত মেহানতের বিবেচনা আপনাগো হাতে। তারা কয়, হুঁ। গাড়ীটা আবার সেই পুরঘাটার পাড়ে আইল। তিব্‌ছ কুইষ্ট্যার বট গাছের কাছ থিক্যা পুরঘাটার বিল পরায় আট মাইল পথ। গাড়ী বট গাছের কাছে আইস্যা থাইম্‌লে ভদ্দলোক চাইরজন গাড়ী থিক্যা নাইম্‌ল। গাড়ীয়ালা আইগিয়া যাইয়া কয়, হুজুররা আমার ভাড়া কত কেম্‌নি দিবেন, তা হ্যান। এই কথা কওয়ার সাথে সাথে গাড়ীয়ালা দেখল চাইর দিক থিক্যা গাড়ী লহরে লহরে ছুইট্যা আইসত্যাছে। কেওইর গাড়ীতে এক ঘুড়া কুন কুন গাড়ীতে ষোল ঘুড়াও আছে। বিলের মধ্যে পানির উপর দিয়া যে গাড়ী খান আস্‌তাছে তার হ্যামায় হাত্তী জুইড়্যা দিছে। এত মস্ত গাড়ীখান যে ষোল ঘুড়াও সে গাড়ী টান্‌বার পারবোনা। চক পাথারের ভিতর হ্যাও অনেক গাড়ী চইল্যা আইল।

ভদ্দলোক কয়জন আর গাড়ীয়ালা সেই সব গাড়ীর দিকে চাইয়া রইছে। বট গাছের চাইরমুর হ্যা আইসা সব গাড়ী থাইম্‌ব্যার লাইগ্‌ল। গাড়ীয়ালা হ্যাখে সেই সব গাড়ীয়াল্‌রা তাম্বুর তাম্বুর এক একটা। তারা হাত্তী কাইল্যা, কুইল্যার মতন কান দুই দিক দিয়া ঝুলে। পোড়া খাইটার রং তাদের গতরে। মুখ বানরের মতন। মনে হয় দশ এগার হাত লম্বা লম্বা। এক একটা বানর। একটারও ঠোঁট নাই। সবগুইল্যা দাঁত হ্যাখা যায়। তাতে মনে হয় যেন সব সুময় তারা দাঁত বিজ্‌লিয়্যা রইচে। ইয়াগো দেইখ্যা গাড়ীয়ালা খুবই ডরাইচে। সে যাইয়া চাইর ভদ্দলোকের গাও ঘেইস্যা খাড়াইল। সব গাড়ীয়ালা গাড়ী থিক্যা নাইম্যা ঐ চাইর ভদ্দলোকের কাছে আইগিয়া হাত পাইত্যা কয়, হুঁজুর আঁমার ভাঁড়াটা (পেতনীরা নাকা কথা কয় ?)

চাইর ভদ্দলোকের খুব রাগ হইছে, রাগে তাগো চোক জ্বইল্যা উঠচে— চাইর জনের আটটা চোখ যেন আটটা আগুনের কুণ্ডু। তারা কান্দি কইর্‌য়া

উঠে আর কয়, ভদ্দলোক মানুষ একটু গাড়ী দাব্‌রাইচি তার আঁবার ভাঁড়া কিঁরে।

ভদ্দলোকরাও যখন এমনি কথা কয়, তখনে গাড়ীয়ালা তাদের পায়ের দিকে চাইছে। চাইয়া স্থাখে একটারও পাও মাটিতে না (পেতনীর পাও সব সময় মাটির এক হাত উপরে থাকপো)। একটা চিৎকার স্থা গাড়ীয়ালা গাড়ীতে যাইয়া উঠল। তখন শ্যাষ রাইত। মান্দারতা গেরামের অনেকেই তার চিৎকার শুনচে—হাইহিরে আল্লা গেছি। গাড়ীয়ালা দুই ঘুড়ার ল্যাগাম খুব কইয়া ধইরা ঘুড়ারে এছা চোটে কয়াকটা ছুটানি দিল যে ঘুড়াগুইন্যা পাগল হইয়া ছুইট্‌ল। কিন্তু সেই চাইর ভদ্দলোক গাড়ীর পাছ ছাড়েনা। তারা বাতাসের সাথে উইড়্যা আইস্‌প্যার লাইগ্‌ল। দুইজন গাড়ীর বাও দিক স্থা মুখ বাড়ায়। তারা কয়, ওঁই, তুঁই ফিঁর‍্যা আঁয়, তঁরে কিঁচু ভাঁড়া দিঁয়া দেঁই।

গাড়ীয়ালার বুক পর্য্যন্ত শুইকিয়া গেছে। তার ধরে জান আছে কি না আছে। অংগ ভঙ্গি দেইখা ডরের চোটে সে মাথা নীচমুখী হুতি স্থা বইল। কিন্তুক চাইর ভদ্দলোক তার পাছ ছাড়ে না। তারা গাড়ীর দুই দিক দিয়া মুখ বাড়াইয়া শুধু কয়, আঁয় তঁরে কিঁচু ভাঁড়া দিঁয়া দেঁই।

এমনি কইর্‌তে কইর্‌তে সে তির্‌ছা কুইষ্ট্যার বট গাছের কাছে আইল। তখন পরায় ফজর অইয়া গেছে। ঐ বট গাছ থিক্যা একটু দূরে হেমচিকাটা গেরাম। সেই গেরামের মজিদে তখন একজন মুছুল্লী আজান দিবার নাগ্‌চে। গাড়ীয়ালা যেই আজানের আওজ পাইচে তেই দ্যাখে যে, ঐ চাইর ভদ্দলোক এক পায় দুই পায় বিদায় হয়। একটু দূরে আইসা গাড়ীয়ালা পাছ পিলে ফিরা চাইচে সে দেখ্‌ল যে ঐ চার ভদ্দলোক তিরছা কুইষ্ট্যার বট গাছের উপরে দাঁড়াইয়া রইচে তাগো পাও গাছের মাথার পাতা ছাইড়্যা এক হাত উপরে। এখনও তারা গাড়ীয়ালারে ডাকে আর কয়, আঁয় তঁর ভাঁড়া নিঁয়া যাঁ। বাড়ী আইস্যা গাড়ীয়ালার ব্যারাম পাইল। ছয় মাস ভুইগ্যা তারপর সে ভাল হয়। ইয়ার পর সে হাজার মাইন্‌ষের মইদে থিক্যাও যদি কুন ভদ্দলোকের ভাড়া লইত তাও তার পায়ের দিকে একবার চাইয়্যা দেইখ্‌তো যে ইয়ার পাও মাটিতে না মাটির এক হাত উপরে।

শিয়াল ডাঙ্গার বিড়াল

আমাগ্যার[১] শিয়াল ডাঙ্গার চর এ্যাটা[২] মস্ত বড় চর আছিল। এ্যাহনে ইয়ার মদ্দি মদ্দি[৩] যে সমুস্ত ছোট ছোট পাড়া স্থাহা যায় তহ্নে[৪] উইয়্যার চিন্ন আচিল[৫] না। তাকে দিনেই দানুর[৬] খেলা অইত[৭]। এ্যাল্হা এ্যাল্হা[৮] কেউই ঐ চকের মধ্যি যাবার চাইত না।

কত সাহসী মানুষ কয়দিন ডরায়া আইল[৯] শিয়াল ডাঙ্গা থিক্যা[১০]। না জানি কইর‍্যা[১১] এ্যালহা চকে যায়[১২]। যায়া যারা ডরায়া আইল তারা বাঁচে নাই। তাগ্যার[১৩] জনমের ভাত খাওয়ায়া[১৪] দিছে দানুতে।

একদিন সামের[১৫] একটু পরে নিজাম তাঐ বুনি[১৬] শিয়াল ডাঙ্গা স্থা[১৭] আইস্প্যার লাগবে ছুবান তাঐগ্যার[১৮] বাড়ী। তহনে[১৯] তার ছ্যামায়[২০] একটা বিলাই আইস্যা[২১] কাচ্চা পারৃতি পারতি[২২] যায়া ছোট্ট একটা করচা ছাপের মদ্দি হান্দায়া যায়[২৩]। নিজাম তাঐ কইচে[২৪] আমি মনে কইরত্যাছি বিলাইড্যা[২৫] স্থুম্বাব[২৬] ছুবান বাইগ্যার[২৭] বাড়ীর। বিলাইড্যা নাম্বায়[২৮] তিন হাতের কম কিছুতেই অইবো[২৯] না। কাছেই একটা ডোবা আছিল।

একটু পরে ডোবার দরে চায়া[৩০] সরম পায়া গেলাম। দেহি[৩১] কি একজন মানুষ পানি খরচ[৩২] করবার লাগচে। ডাকপারি[৩৩] তা সে কতা[৩৩] কয়না।

১। আমাদের ২। একটা ৩। মধ্যে ৪। তখন ৫। ছিলনা
৬। প্রেতের ৭। হইত ৮। একা ৯। আসিল ১০। হইতে
১১। করিয়া ১২। যাইয়া ১৩। তাহাদিগকে ১৪। খাওয়াইয়া
১৫। সন্ধ্যার ১৬। নাকি ১৭। দিয়া। ১৮। তাঐদের
১৯। তখন ২০। সামনে ২১। আসিয়া ২২। লম্ফ দিতে দিতে
২৩। ঢুকিয়া ২৪। কহিয়াছে ২৫। বিড়ালটা ২৬। সম্ভব
২৭। ভাইয়ের ২৮। লম্বায় ২৯। হইবে ৩০। দিকে তাকাইয়া ৩১। দেখি ৩২। শৌচ কার্য্য ৩৩। ডাকি

আমরা হা করিয়া নিজাম তাঐর মুখের দরে চায়া রইচি[৩৫] নিজাম তাঐ ফরুত ফরুত হুকক্যা[৩৬] খায়া[৩৭] গপ্পডা কয়া খ্যালা[৩৮] করচে।

ঐ মানুষ আবার বিলাই হয়া গিচে[৩৯]। তখনে মনে মনে চান দিল[৪০] এত্তোরে আদতে বিলাই বা মানুষ কিছুই না। এতো শিয়াল ডাঙ্গার স্থাউ দানু[৪১] আমাকে একলা পায়া[৪২] আমার সাত্তে[৪৩] প্যাছ খেলবার লাগ্‌চে। আমি কৈল্যাম[৪৪], স্থাখ্‌ তুই আমার পথ ছাইড়্যা দিয়া লীলা খেলা[৪৫] কর।

কিন্তুক বিলাই[৪৬] আমার কথা মানে না। ও বড়ই উতুরি নাগায়া দিচে[৪৭]। তহনে[৪৮] উইয়্যার[৪৯] মাতা পিতার দুয়াই[৫০] দিল্যাম তাও কিছু হয় না। ও অইচে[৫১] একটা দুইর্যাচার[৫২] ও ক্যানে[৫৩] মাতা-পিতার দুয়াই মান্‌বি[৫৪]।

তহন আমি আমার কাম সাইরল্যাম[৫৫]। পরথমে[৫৬] রাস্তা বন্দ দিল্যাম, যাতে ও আর আমার কাছে না আসে। কিন্তুক দেখি কি তাও উডা[৫৭] মানতি[৫৮] চায় না। তহনে শরীল বন্দ দিল্যাম[৫৯]। এতস্যাত[৬০] বন্দ দিয়াও আমার শরীল ছম্‌ ছম্‌ করবার নাগল[৬১]। ও যে পাছ ছারেনা, আমার যুনি[৬২] আইজ[৬৩] খালি[৬৪] ডর ডর[৬৫] করে। এমুন সুময়ে[৬৬] ওস্তাদের বাক্যিডা[৬৭] মনে পইল। ওস্তাদ একদিন আমাকে কয়া দিচিল[৬৮] যে, যদি কুন[৬৯] বিপাকে পড়স কুন কিছুতেই যদি কাম না হয় তাইলে[৭০] কুণ্ডলী দিস্‌। আমার চাইর মুর স্থা[৭১] একটা কুণ্ডলী দিয়া নয়া[৭২] তার মদ্দি বইস্যা নইল্যাম[৭৩]।

৩৪। কথা। ৩৫। রহিয়াছি। ৩৬। হুকা ৩৭। খাইয়া
৩৮। খেলা ৩৯। হইয়া গিযাছে ৪০। উদয হইল ৪১। ভূত প্রেত
৪২। পাইয়া ৪৩। সাথে ৪৪। কহিলাম ৪৫। খেলা ৪৬। বিড়াল
৪৭। দিয়েছে ৪৮। তখন। ৪৯। উহার ৫০। দোহাই
৫১। হইয়াছে ৫২। দুরাচার (দানব) ৫৩। ওটা কেন ৫৪। মানিবে
৫৫। সারিলাম ৫৬। প্রথমে ৫৭। ওটা ৫৮। মানতে ৫৯। দিলাম
৬০। এত ৬১। লাগিল ৬২। যেন ৬৩। আজ ৬৪। শুধু
৬৫। ভয় ৬৬। সময় ৬৭। বাক্যটা ৬৮। দিয়াছিল ৬৯। কোন
৭০। তাহা হইলে ৭১। দিয়া ৭২। লইয়া ৭৩। রহিলাম

দেহি কি[৭৪] বিলাইও নাই, কিছুও নাই। চাইর মুরস্থা কয়হাকটা[৭৫] দাঁত বাইর করা সিংয়ালা বুচা ভাম্বিড্যা[৭৬] বিট্কাল। কালাসী অয়া[৭৭] গেছে তার গতর যুনি[৭৮] পুড়া খাইট্যার গতর। হগগল কয়ডারই[৭৯] মাথায় আগুনের পাইল্যা[৮০] দব্দবায়া জ্বইলত্যাছে তার জন্যিই তো উইয়াগ্যার আকিরতি[৮১] দেইকপ্যার[৮২] পারি। এ সুমায়[৮৩] আমার গলা শুকায়া[৮৪] গেল। গাও[৮৫] কাটা স্থা[৮৬] উঠছে।

চাইর মুর থ্যা[৮৭] বিট্ক্যাল দুইষ্ট্যার[৮৮] যহনে[৮৯] আগুনের পাইল্যা জ্বালায়া[৯০] আমার কুণ্ডলীর দরে[৯১] আসে তহন মনে হুয় হাইহিরে[৯২] করি কি কুণ্ডলী বুঝি আইজ না মানে, আমি যুনি দুইল্যাইর মইদ্দেই[৯৩] দজুকের দরজা স্থা মুখ বাড়ায়া[৯৪] দিচি। এসুমায় আমার উস্তাদের উপরও আমার বিশ্বাস খই অয়া যাইত্যাছে। এই বুঝি আমার কুণ্ডলীর মইদ্দে আইল। চায়া দেহি উয়াগোর[৯৬] মুখ স্থা যে নেব্রি বাইরিত্যাছে[৯৭] তার মদ্দিও[৯৮] আগুন জ্বলে। ঐ নেব্রির মদ্দি আগুন জ্বল্তি[৯৯] জ্বল্তি মুকের দুই মুইর্যা স্থা দুইড্যা[১০০] আগুনের শুইড়্যার মতন বাইর্যায়[১০১]। এ সুমায় আমি আর নাই। যহনে উর্যারা[১০২] আমার কুণ্ডলীর পাশ ঘেইসা আইস্থা খাড়ায়া[১০৩] পইল। তহনে চাইর মুরস্থা পাহারের ন্যাগাল মস্ত মস্ত দুইর্যাচারের মধ্যিহানে[১০৪] আমি যুনি ছোট্ট একটা সিন্দুইর্যা পুকা। আমার পাঁচ পরান কামারের হাতুরি পেটার মত আওজ করবার নাগ্ল। কি আর করুম[১০৫]। আর কুন উইপ্যায়[১০৬] নাই। দুই আটুর[১০৭] নীচে মাথা ঠেকায়া[১০৮] দিয়া টিটি পক্ষীর[১০৯] ন্যাগাল বইস্থা[১১০] নইল্যাম।

৭৪। দেখি ৭৫। কয়েকটি ৭৬। মস্তবড় ৭৭। হইয়া ৭৮। যেন
৭৯। কয়টারই ৮০। পাতিল ৮১। উহাদের আকৃতি ৮২। দেখিতে
৮৩। এ সময় ৮৪। শুকাইয়া ৮৫। গ্রাম ৮৬। দিয়া ৮৭। হইতে
৮৮। দুষ্টরা ৮৯। যখনে ৯০। জ্বালাইয়া ৯১। দিকে
৯২। হায়রে ৯৩। মধ্যেই ৯৪। বাড়াইয়া ৯৫। দিয়া
৯৬। উহাদের ৯৭। বাহির হইতেছে ৯৮। মধ্যে ৯৯। জ্বলতে
১০০। দুইটা ১০১। বাহির হয় ১০২। উহারা ১০৩। দাঁড়াল
১০৪। মধ্যখানে। ১০৫। করবো ১০৬। উপায় ১০৭। হাটুর
১০৮। ঠেকাইয়া ১০৯। চাতকের ১১০। বসিয়া

খানিক পরে চায়া দেহি উইয়্যারা যতই নীলা খেলা করুক, কিন্তুক আমার কুণ্ডলীর মইদ্দে আইস্‌প্যার পাইল্ল না[১১১]। তহনে আমার মনের মদ্দি খানিকট্যা বল পাইল্যাম। আমার ওস্তাদের উপর বিশ্বাস ফির‍্যা[১১২] আইল। হঠাস দেহি কি আর কুন আগুন নাই, কিছু নাই, খালি শুইন্স্যা চর আন্দারের মদ্দি থম থম করতাছে। একবার মনে করি, একটা নুড়ন্স্যা[১১৩] চইল্যা যাই। আবার সাবাস[১১৪] হয় না। কিন্তুক কুন দিক আর কিছু নাই। কতুক্ষণ আর শুইন্স্যা চরে বইসা থাহা[১১৫] যায়। বইস্যা আছিলাম খাড়াইল্যাম[১১৬]। আমার মতলব যে নাঠি নয়[১১৭] চোখে মুখ বুইজ্যা গুড়ু গুড়ু কইর‍্যা এক নুড়[১১৮] দিমু যা থাকে কপালে। কেবলই উহঠ্যা খাড়াইচি অমনি দেহি কি চাইরড্যা হুইয়্যার[১১৯] ঘুদ্‌ ঘুদ্‌ কইরতে কইরতে আইসত্যাছে আমার কুণ্ডলীর দরে। ইস্যিরে[১২০] যদি আমি নুড় দিতাম তাইলে না আমারে ফাইড়্যা[১২১] ফালায়া দিত। আমার শরীলে তহ্নে[১২২] ঝড়ি অইস্যা গেল। খালি থর্‌ থর্‌ করতাছে। যেই শুইয়্যার আমার কুণ্ডলীর কাছে আইল তেই দেখি কি উইয়্যারা সে আমার কুণ্ডলীর চাইর মুর দ্যা কাওয়াত[১২৩] করে কিন্তুক কুণ্ডলীর মইদ্দে আইসপ্যার পারে না। তহনে আমার ধরে[১২৪] কিছুডা পানি আইল। আবার দেখি কিছু নাই চাইর মুর আন্দার নিঝ্‌ঝুম অনেকক্ষণ যায়, আর আমার বইস্যা থাইক্‌প্যার মনে কয় না। একবার মনে করি নুড় দেই আবার মনে হয়, নারে। নুড় দিলে যে ও আমার দফা সাইরবো। তহন ইচ্ছা হয় খুব জোরে একটা চেরেৎকারদ্যা[১২৫] একজনকে ডাক দেই। পাড়ায় থ্যা[১২৬] এখন ডাক শুনবো, রাইতের ডাক তো অনের দূর থ্যা শুনা যায়। তা আর হইয়া উইঠলো না। এগেরদারের[১২৭] মইদ্দে আমার সাবাসের নাম আছে আইজ যদি বিপাকে পইড়্যা চেরেৎকার কইর‍্যা[১২৮] মাইনষেরে ডাক দেই তাইলে চেরকালের

১১১। পারিল না ১১২। ফিরিয়া ১১৩। দৌড় দিয়া চলিয়া যাই ১১৪। সাহস ১১৫। থাকা ১১৬। দাঁড়াইলাম ১১৭। লাঠি লইয়া ১১৮। দৌড় ১১৯। শুকর ১২০। ইস্‌ ১২১। চিরিয়া ফেলিত ১২২। তখন ১২৩। পায়তারা ১২৪। দেহে ১২৫। চিৎকার ১২৬। হইতে ১২৭। এ অঞ্চলের

মত এ্যাটা খুটা অইয়া[১২৯] যায়। মনের মইদ্দে এইমত চিন্তা ভাবনা কইর্‌ত্যাছি এমন সুমায় দেহি[১৩০] ঢুন্, ঢুন্, ঢুন্, ঢুন্ আওজ অয়[১৩১]। কান খাড়া কইল্ল্যাম[১৩২] দেহি গলায় ঘুণ্টা বান্দা মস্ত এক হাতী আমার দরে আইস্যা পইল বুইল্যা[১৩৩]। উডা আইস্যা আমার কুণ্ডলীর ছ্যামায়[১৩৪] খাড়ায়া[১৩৫] হুর[১৩৬] বাড়ায়া আমার মাথা ধরবার চায়। কিন্তুক পারে না। যুদিও আমি ওস্তাদের ঠায়[১৩৭] শুইন্যাছি যে কুণ্ডলীর সীমা কুণ্ডলীর পরিমাণে আসমান আর কুণ্ডলীর পরিমানে পাতাল তুরি[১৩৮] তাও আমার জানডা[১৩৯] দাপু বাপু করবার নাগল। দেখচে মাথার উপর যুদি হাতীর হুর ন্যাল-ব্যাল[১৪০] করে খালিই ধরবার চায়। ধরবার না পাল্লেই কি এমন ভয়ের চুইর্‌ল্যাৎ[১৪১] কতক্ষুণ চাইয়া খ্যাখা যায়।

আমি চোখ বুইজ্যা কুণ্ডলীর মইদ্দে শুইয়া নইল্যাম। যখন আবার আমি চোখ খোলচি তখন দেহি ব্যাল[১৪২] উঠছে। আমি ও ভিজ্যা চ্যাবচ্যাবা[১৪৩] হয়া গেছি।

১২৮। করিয়া ১২৯। হইয়া ১৩০। দেখি ১৩১। শব্দ হয় ১৩২। করিলাম ১৩৩। এই বুঝি আসিল ১৩৪। সামনে ১৩৫। দাঁড়াইয়া ১৩৬। শুঁড় ১৩৭। নিকট ১৩৮। পর্য্যন্ত ১৩৯। প্রাণটা ১৪০। আঁকাবাঁকা হয় ১৪১। মুহূর্ত ১৪২। বেলা ১৪৩। ভিজিয়া যাওয়া।

পূর্বাভাষ

কথিত আছে যে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে নবাব মীর কাসিমের লস্কর তেরশ্রীর জমিদারের কাছে করের তাগিদ দিতে আসে। জমিদারের সর্দারদের সঙ্গে তাহার বাজী হয়। সে যদি বড় পয়লার জুম্মাঘরে একা থাকিতে পারে তবে তাহাকে পেট ভরিয়া রসগোল্লা খাওয়ান হইবে। আর যদি তাহা না পারে তবে সে জমিদারের সর্দারদিগকে পাঁচটি টাকা দিবে। নবাবের লস্কর জুম্মাঘরে রাত্রি যাপন করিতে যায়, কিন্তু পরের দিন তাহার মৃত দেহ পাওয়া যায়। মৃত্যুর পর লস্কর প্রেত হইয়াছে—ইহাই জনসমাজে প্রচলিত। সে নানারূপ ধারণ করিয়া মানুষকে ভয় দেখায়। অবস্থান—গ্রাম—বড় পয়লা, পোঃ—তেরশ্রী ইউনিয়ন—পয়লা, থানা—ঘিওর, জিলা—ঢাকা।

স্যাওড়া গাছের চাচী

মিয়াচান হাজী সাবের খুব ভাল একটা ঘুড়া[১] আছিল। পূব্ব কালাইনা[২] দিনের কথা। তখনে জমি জমা লইয়া কাড়াকাড়ি আছিল না। বহুত জাগা-জমি পতিত থাইকত। সে সুমায়[৩] দুই চাইরটা ঘুড়া-গরু আল্‌গা থাইকলে মাইন্‌ষে বেশী কিছু কইত না। মিয়াচান হাজীর ঘুড়াটা পরায়ই আল্‌গা[৪] থাইক্‌ত। ঘুড়াটা ভাল, তাইত উটা[৫] আল্‌গা থাইক্‌লেও মাইন্‌ষে বড় বেশী কিছু কইত না।

একদিন ঘুড়া গেল হারাইয়া। হাজী সাবের ভালবাসা ঘুড়া। সে পাগলের মত অইয়া ঘুড়া তালাশ কইরব্যার লাইগ্‌ল। নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়া মিয়াচান হাজী ঘুড়া তালাশ কইল। কিন্তুক[৬] ঘুড়া পাওয়া গেল না।

পরের দিন মিয়াচান হাজী দূর দূরান্তের চকে গেল ঘুড়ার তালাশে। সারাদিন ভইরা ঘুড়া তালাশ কইর‍্যা হাজী সাব পেরেসান অইয়া গেছে। সন্ধ্যার আগে হাজী সাব বাড়ীর কাছাকাছি চকে আইচে। কোমরদুয়ালের[৭] পাড়ে আইস্যা হাজী সায়েব যখনে এপিলে সেপিলে[৮] চাইয়া ঘুড়ার খোঁজ কইরত্যাছে তখনে সন্ধ্যা বইয়্যা গেছে। হাজী সাব কিছুটা দূরে ঘুড়ার মতন একটা জন্তু দেইখল। বাইল্‌-জুস্‌না বাইল জুস্‌না আশমান। ভাল মতন দ্যাখা যায় না। আব্‌ছা আব্‌ছা[৯] দ্যাখা যায়। হাজী সাব মনে মনে কয়, হারামজাদা ঘুড়া, দুইদিন ভইর‍্যা তালাশ কইর‍্যা তোমারে পাইছি, আর কি তোমারে ছাইড়্যা দিমু। এই কইতে কইতে হাজী সাব ঘুড়ার পাছ লাইগ্‌ল।

কিছুদূর যাইয়া হাজী সাব আরু একজন মাইন্‌ষের ছ্যাকার[১০] মতন দেখে সে লোকটাও ঐ ঘুড়ার পাছ পাছ ধাওয়া কর্‌চে। চৈত মাইস্যা দিন ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে মটর কলই পাইক্যা শুইকিয়্যা রইচে। ঘুড়া যে ম্যালা দিচে তার পায়ের মট্‌মট্‌ শব্দ পাওয়া যায়।

১। ঘোড়া ২। পূর্বকালের ৩। সময় ৪। বন্ধন মুক্ত ৫। ওটা ৬। কিন্তু ৭। একটা মরা বিলের নাম ৮। এদিক

যে লোকটার ছ্যাকার মতন দ্যাখা যায়, হাজী সাব তারে ডাক দ্যা কইল তুমি যাও ক্যারা। সে কয়, আমি নাদেম আলী সর্দার। আমার একটা বোকন্ হারাইচে, সেই বকন্ডা এতক্ষণে পাইচি। বকন্তো ধইর্ব্যার পারি না। উয়ার[১১] সাতে সাইরব্যার পারি না। বকন কলই ক্ষ্যাত গু: মচ্মচাইয়া ম্যালা করচে।

হাজী সাব কয়, এডা তোমার বোকন না, এডা আমার ঘুড়া। দুইদ্দিন ধইর্যা ঘুড়া তালাশ কইর্যা আইজ আমি ঘুড়া পাইচি। কেন্তু আল্গা খাইয়া ঘুড়ার কুইয়্যাদ বাইড়্যা গেছে। ঘুড়া তো দোরবার পারি না।

নাদেম আলী সর্দ্দার হাজী সাবকে ঠিক পাইচে। সে কয়, হাজী সাব এডা[১৩] আপনের ঘুড়া না, এডা আমার বোকন্। হাজী সাব কয় না, নাদেম এডা আমার ঘুড়া, আমি পষ্ট[১৪] দেখচি।

এইভাবে কথা কইতে কইতে দুই জন ম্যালা দিচে। যাইতে যাইতে তারা পরায় গেরামের কাছে গেছে। এমন সময় বোকন্ বা ঘুড়া করচে কি সবাসব নয়ান বুইড়্যার বাড়ী য ইয়্যা উইঠ্ল। কুইত্ত্যারও[১৫] চিরিৎকার করে, নয়ান বুইড়্যাও হাউমাউ কইর্যা কান্দে। নাদেম আলী আর হাজী সাব কিছুই বুঝে না।

তারাও দুইজন যাইয়্যা নয়ান বুইড়্যার বাড়ী উইঠ্ল। নাদেম আলী সর্দ্দার কয়, বুইড়্যা আমার বোকন্ তোমাগো[১৬] বাড়ী আইস্যা উইঠ্ল। বোকন্ গেল কুন জাগায়। হাজী সাব কয়, নয়ান আমার ঘুড়া দেখচাও না।

নয়ান বুইড়্যা কয়, হ তা ঠিকইতো, উডার ব্যাক্খানি বোকন্ আর ব্যাক্খানি ঘুড়া, উডা য ন বাঘ। আমি বুইড়্যা মানুষ, আমার চোখ উঠ্ছে। চোখের জ্বালায় আমি অস্থির। ই সুমায় বাঘ আইস্যা কুইত্তা ধইল আমার ছ্যামনে। কুইত্ত্যাডা এই চিক্কুইর শ্যাষে আমার ধমকে বাঘ কুইত্ত্যা ছাইড়্যা গ্যা[১৭] গেল।

সেদিক ৯। অস্পষ্ট ১০। ছায়ার ১১। উহার ১২। কিন্তু
১৩। এটা ১৪। স্পষ্ট ১৫। কুকুরে ১৬। তোমাদের

নাদেম আলী সর্দ্দার কয়, মরচিতো আমিতো খুব বোকনের পাছ ধরচিলাম। হাজী সাব তখনে বাড়ী ম্যালা দিল।

যাইতে যাইতে হাজী সাব বড় পয়লার জুম্মার পাছ কোনা গেছে। এমন সময় এক স্যাওড়া গাছের তলে মুন্সি বাড়ীর একজন ম্যায়াছেইল্যা ঘসি সুরে[18] হাজী সাব তারে দেইখ্যা ঠিক পাইচে। হাজী সাব কয়, চাচি, এখনে রাইত দুপুরেরও বেশী, এত রাইতে ঘসী সুরক্যা। তোমার সাতে[19] আর কেওই[20] নাই। তোমার কি একলা একলা ডর করে না।

আর চাচী কোন কথা কয় না। হাজী সাব তখনে তাত্ কাছে আইগিয়া গেল। হাজীর আইগ্যান দেইখ্যা চাচি কল্লকি হরহরাইয়া[21] স্যাওড়া গাছে উইঠ্ল। চাচির আছিল ফুরফুইর‍্যা ধলা কাপড় পেন্দা—গাছের পাতার ফাঁকত্থা স্থাখা যায়।

চাচী কয়, হাঁজী তুঁই কাঁমের নঁষ্ট কল্লি। নাঁদেম আঁলীরে আঁমি এ্যাহাবারে মাঁইরত্যাম। উঁম্নাইগো জঁইন্নে আঁমি প্যাঁত্ অঁইচি। জঁমিদারের সর্দ্দারেরাই আমারে জুঁম্মায় থাঁইক্প্যার কইচিল, তাঁইতে আমার ইঁদশা।

হাজী সাব তাড়াতাড়ি যাইয়া মুন্সীবাড়ী উঁইঠ্ল। মুন্সীর দাদা তখনে চ্যাতনই আছিল। হাজী সাব তার কাছে সগল[22] কথা কইল। সে কয়, তুমিতো জাননা, আমাগো এ জাগাডা[23] ভয়েরই জাগা। খাও, এখনে তামুক খাও, ডরাও তো নাই। হাজী কয় যে, সে ডরায় নাই।

১৭। দিয়া ১৮। ঘসি কুড়ানো ১৯। সাথে ২০। কেহ
২১। দ্রুত ২২। সকল ২৩। এ জায়গাটা

পূর্ব কথা

[ধামশর গ্রামের কাসিম-ডাঙ্গা (ক্ষুদ্র জলাশয়) ধামশর ইউনিয়নের অন্তর্গত। থানা—দৌলতপুর, মহকুমা—মানিকগঞ্জ, জিলা—ঢাকা।

কাসিমডাঙ্গা সম্বন্ধে প্রচলিত কিংবদন্তীটি সত্য কিংবা মিথ্যা তাহা আজ বলা দুষ্কর। কাসিম-ডাঙ্গার নিকটে এখনও একটি পরিত্যক্ত ভিটা আছে। উহাই যে রাম রতন বাগ্চীর (জমিদারী প্রাপ্তির পর রাম রতন রায় চৌধুরী) ভিটা তাহা সত্য।

বাগচি মহাশয় ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে নবাব মীর কাসিমের দরবারে চাকুরী করিতেন। ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দে তিনি যে নবাব মীর কাসিমের অনুগ্রহে মাত্র ১১।০ আনা কর ধার্য্যে মানিকগঞ্জ মহকুমার এক বিরাট ভূখণ্ড ও সিলেটের বেজোড়া পরগনার জমিদারী স্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন ইহা ঐতিহাসিক সত্য। রাম রতন রায় চৌধুরী বংশের পরবর্তী আরো ছয় পুরুষ জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের (পাক ভারতের আযাদী লাভের পর) পূর্ব পর্য্যন্ত উল্লিখিত এলাকার জমিদার ছিলেন।]

কাসিম-ডাঙ্গা

ধামশরের মুচি পাড়ার বগুলে[১] এ্যাখনেও একটা পাড়ভাঙ্গা ডাঙ্গা দেখা যায়। মাইনষে ইড্যারে কাসিম-ডাঙ্গা,[৩] কাসিম-ডাঙ্গা করে।

দশ বার বছর বসের[৪] সুমায় দাদামিয়ার কাছে ঐ কাসিম-ডাঙ্গার একটা গল্প শুন্‌ছিল্যাম[৫]। তানের মুরব্বিগো[৬] কাছে তানের শোনা কথা।

একবাব নবাব মীর কাসিম হাতী-ঘুড়া, লোক-লস্কর লইয়া এই জাগাগু[৭] যাইব্যার লাগ্‌ছিল। এই জাগায় আছিল্‌ এক বাউনা[৮] আর এক বাউনী[৯]। তারা এত গরিব আছিল যে নিত্যি ভিক্ক্যা[১০] তনু রক্ষা। তাগো বাড়ীর ছ্যামায় আছিল ছোট্ট একটা ডোবা।

রাত্রিতে বাউনা আর বাউনী শুইয়্যা ঘুম আইচে[১১]। বাউনী খুয়াপে ছ্যাখে, খুব ছফেত ধলা এক আম্বিয়া তারে কইত্যাছে, ওই, তর[১২] দিন ফিরা্যা গেছে। তখনই একটা ধব্‌ধবা ধলা বাড়ী দেখা গেল, কত্ত[১৩] দালান কুঠা সে বাড়ীতে—জালালী কৈতর[১৪] গুইলা বক-বকুম্‌, বাকুম বাকুম্‌ কইরত্যাছে— আর আছে তায় তালাপ, ফল গাছ, ফুল বাগিচা, দাসদাসী।

আম্বিয়া বাউনীরে সেই বাড়ী ছ্যাখায় আর কয়, ঐ বাড়ী তর[১৬]। রাইত পুহাইলেই তুই তর বায়ুনরে বল্‌বি, সকালে কয়েক সের দুধ, এক কলসী ভাল পানি, আর কয়েকটা ডাব লইয়া মুচি পাড়ার কাছে যে ডোবাডা[১৭] আছে তার বোগলের[১৮] বোড়ই[১৯] গাছটার নীচে বইস্যা থাক গিয়া।

যখনে দেখ্‌পা যে হাত্তী-ঘুড়া, লোক লস্কর খুব হামরাই কইর‍্যা আইসত্যাছে

১। নিকটে ২। শুকনা ৩। জায়গার নাম ৪। বয়স

৫। শুনিয়াছিলাম ৬। মুরব্বিদের ৭। জায়গা দিয়া ৮। ব্রাহ্মণ

৯। ব্রাহ্মণী ১০। ভিক্ষা ১১। আসিয়াছে ১২। তোর

১৩। কত ১৪। কবুতরগুলি ১৫। পুকুর ১৬। তোর

১৭। ডোবাটা ১৮। নিকটের ১৯। কুল (ফল) ২০। শোভাযাত্রা

তখনেই এই সমস্ত জিনিষ নিয়া তাগো[২১] ছামনে নামাইয়া দিয়া গলবস্ত্র[২২] হইয়া জোড় হস্ত হইয়া দাঁড়াইবা।

খুয়াপে থ্যা[২৩] চ্যাতন হইয়্যা বাউনী ধর্‌পরাইয়া[২৪] উইঠ্যা[২৫] বাউনারে ডাক দিচে, উঠচে, আরতো দেরী নাই, রাইত্‌তো ধলপুহা[২৬] দিচে।

বাউন কয়, কি অইল[২৭] আবার, তুমার জালায় একটু শান্তিহালে ঘুম পাইড়্‌তে পারি না।

বাউনী কয়, খুব ঘুম পাড়। সারাজনম ঘুম পাড় আর পরের বাড়ী ভেগ টাইন্যা[২৮] টাইন্যা খাও।

বাউন কয়, এত রাগ কর ক্যানে, খুইল্যামা[২৯] কইস্যা কও। তখন বাউনী খুয়াপের সকল কথা তারে কইল।

সারাজনম কাইট্যা গেছে ভিক্যা কইর‍্যা, কত কষ্ট গেছে জেবনভর। এমন একটা আশার কথা সেই বাউন তার জনমেও শুনে নাই। বাউনীর খুয়াপের কথা শুইন্যা পরানডা[৩০] তার টগরবগর্‌ কইর্‌ত্যাছে।

রাইতের আন্দার থাইক্‌তেই বামুন ডাবের উদ্দিশে[৩১] গেল। পয়সা দিল সগল দিল, তাও গাছে চইড়্যা ডাব পারুন[৩৩] নাইগ্‌ল। তাতে বাউনের বোক ছুইল্যা কত রক্ত পইল।

বাড়ী আইস্যা বাউনীর কথামত সে সেই ডোবার কাছে বোড়ই গাছের গোরে কিছু জাগা[৩৫] পরিস্কার কইর‍্যা সেই সব জিনিস নইয়া[৩৬] বইস্যা নইল[৩৭]।

বেলা ঠিক দুপুরের কালে নবাব সাব হাত্তী-ঘুড়া লোকজন লইয়া আইস্যা ঐ ডোবার পাড়ে তাম্বু[৩৮] ফালাইল।

২১। তাহাদের	২২। গলবস্ত্র	২৩। হইতে	২৪। তাড়াতাড়ি
২৫। উঠিয়া	২৬। হইযাছে	২৭। হইল	২৮। ভিক্ষা
করিয়া	২৯। খুলিয়া	৩০। প্রাণটা	৩১। খুঁজিতে
৩২। সকল	৩৩। পাড়িতে	৩৪। কুল	৩৫। জায়গা

এখন বাউন মনে মনে ভাবে, কাছে যামু কি, যামুনা! কিছুতেই তার দেলে সাহস আসে না। কিন্তু যখন তার মনে পইল, যদি কাছে না যাই তাইলে[৩৯] তো বাউনী বাইড়্তে[৪০] উইঠ্প্যার দিবো[৪১] না। তখন মরণ বাচন কবুল কইর্যা ঐ সমস্ত জিনিষ নিয়া যাইয়া লবাব সাবের তাম্বুর ছামনে দাঁড়াইল। ওগুলি নামাইয়া দিয়া বাউন তো গলবস্ত্র[৪২] হইয়া জোড় হস্ত কইর্যা নইল।

লবাব সাব আস্লেই পিয়াসায় খুব কাতর হইচিল্যান। তানি[৪৩] তো ডাব পাইয়া খুব খুশী হইল্যান। তান[৪৪] তখনে ডাবের পানি খাইল্যান বাবুর্চি দুধ জ্বালান কইর্যা তানেরে[৪৫] খাওয়াইল।

তামুতে কিছুক্ষণ গড়াগড়ি দিয়া নামাজের সময় উইঠা বাউনের স্থাওয়া পানি স্থা[৪৬] অজু কইর্যা তান নামাজে খাড়াইল্যান[৪৭]।

এ সময় একটা ঘুড়া কর্ছে কি ঐ ডোবায় পানি খাইব্যার নামছে। ঘুড়া জাতি টল্টলা পানি খায় না, ওরা[৪৮] ঠ্যাং লাড়াচাড়া কইর্যা পানি একটু ঘুলা কইরা লয়। ঘুড়াটা দুই পাও পানিতে দিয়া খুব লাড়াচাড়া কইর্ত্যাছে। ইয়ারি[৪৯] মইধ্যে কি যুনি একটা আইস্যা ঘুড়ার পাও কামড়াইয়া ধইল্ল। তখন ঘুড়া তো খুব চিৎকার। মস্তবড় একটা তাজী ঘুড়া, কমতো শক্তি রাখে না, উডা[৫০] এই কুঁদিফান্দি লাগাইয়া দিল আর কি। কিন্তু হাজার কুঁদি-ফান্দি কইর্যাও কোন ফল হইল না। আর তো উইঠ্প্যার প্যারে না। উইঠ্প্যার পারে না, পারে না, আর পাইল্লই স্থা[৫১]।

সক্কল লোক-লস্করের মুখ শুইকিয়া গেল। কি আর কইরবো[৫২] তারা, লবাব সাবের হুকুম, ঐ ঘুড়াটা আগ্লা থুইতেই হইবো[৫৩]। কার সাহস ঐ ঘুড়া বান্ধে। এইটা লবাবের সব চাইতে পিয়ারা ঘুড়া।

যন্ত্রণার চোটে ঘুড়া তো ধারাস্ স্থা[৫৪] পানির কিনারে পইর্যা গেল।

৩৯। তাহা হইলে ৪০। বাড়ীতে ৪১। দিবে ৪২। গলবস্ত্র ৪৩। তিনি
৪৪। তিনি ৪৫। তাঁহাকে ৪৬। দিয়া ৪৭। দাঁড়াইলে
৪৮। উহারা ৪৯। ইহার ৫০। ওটা ৫১। না

(৩৬। লইয়া ৩৭। রহিল ৩৮। তাবু)

এ সময় লবাব সাবের নামাজ সারা অইচে[৫৫]। তান আইগিয়া আইল্যান। কি আর কইরব্যান তান, কোন উপায় নাই, যে জনারে ধরচে অরে।

তখন এক মুচি ছ্যামরা ঘুড়ার কাছে আইগিয়া যাইয়া পানির মধ্যে লির্খ্যা কইর‍্যা কি যুনি[৫৮] দেইখ্‌ল। টানে আইস্যা সে কয়, হুজুর আমি ঠিক পাইছি কিসে ধর্‌ছে অরে[৫৯]।

সে দৌড়াইয়া যাইয়া তাগো[৬০] পাড়ায় থ্যা[৬১] সত্তুর আশীজন লোক লইয়া আইল। সকলের হাতেই তিন কাইল্যা ট্যাটা[৬৩]।

তারা আইস্যাই দশে বিশে ট্যাটা ফ্যাকা[৬৪] সুরু কইল। সগল[৬৫] ট্যাটাই মচ্‌মচ্‌ গাইড়্যা[৬৬] পড়ে। কৈলে বিশ্বাস যাইব্যান না, ডোবার পানি লাল ছরকা অইয়া গেল। শ্যাষে সত্তুর আশী জন লোক ট্যাটা ধইর‍্যা টাইন্যা উঠায় সেই জনার প্রকাণ্ড এক ছুয়া[৬৮]। মইর‍্যা যেতুন ঘুড়ার পাও ছাড়ে নাই—কামুড় দ্যা লাইগ্যা রইচে। সেই ছুয়ার মুখ কাইট্যা তার পর ঘুড়ার পাও ছাড়ান হয়।

সগলতে ইয়া দেইখ্যা আটাস গেল। তারা কয়, এই বনে এই বাঘ, ভাগ্যে সেন মুচিরা মরা গরুর চামরা ভিজায় দেইখ্যা ইয়ার[৬৯] মধ্যে আমরা নামি না। তাইলে[৭০] তো আর রক্ষা আছিল না।

লবাব সাব হুকুম দিয়া গ্যালান যে, ঐ বাউন ব্যাটা ঐ ডোবাটা ভাল কইর‍্যা কাটাইয়া দিবে[৭১]। আর মাসে মাসে একবার কইর‍্যা জাল দ্যা[৭২] সেই ডাঙ্গাটা ছাবান লাগ্‌বো যাতে উয়ার মধ্যে কাছিম না থাইকপ্যার পারে। যা খরচ লাগে তা লবাবের দরবারে যাইয়া ঐ বাউন লইয়া আইসপো[৭৩]।

সেই ডাঙ্গা কাটানের পর বাউন যায় লবাবের দরবারে। লবাব সাব তার উপরে আগে থ্যাথ[৭১] তুষ্ট আছিল্যান, তারপর তান[৭৫] দেইখ্‌ল্যান।

৫২। করিবে ৫৩। হইবে ৫৪। দিয়া ৫৫। হইয়াছে
৫৬। তিনি ৫৭। এক দৃষ্টে ৫৮। যেন ৫৯। ওকে
৬০। তাহাদের ৬১। হইতে ৬২। তিনটি কালওয়ালা ৬৩। টেটা (মাছ ধরার যন্ত্র) ৬৪। নিক্ষেপ করিল ৬৫। সকল ৬৬। বিদ্ধ হয় ৬৭। বলিলে ৬৮। কচ্ছপ ৬৯। ইহার
৭০। তাহা হইলে ৭১। দিবে ৭২। দিয়া ৭৩। আসিবে

যে বাউনের মধ্যে এক পয়সারও ছল চাতুরী নাই। তখনে লবাবের দরবারে বাউনের একটা চাকুরী হয়।

কালে কালে বাউন আরু[৭৬] ভাল কাজ কাম করে। লবাব সাব তানের উপর তুষ্ট হইয়া ছেলেটের বেজোড়া পরগনা আর মানিকগঞ্জ মহকুইম্যার খাইওয়াক এই বাউনকে দান করেন। মুটেই ১৯৷৷৹ আনা খাজনা দেউন লাগ্‌ব। তানের নামই রাম রতন রায় চৌধুরী।

৭৪। পূর্ব হইতেই ৭৫। তিনি ৭৬। আরো ৭৭। খানিকটা।

বৌদ্ধের হস্তীর কিংবদন্তীর পূর্বাভাষ

কথিত আছে যে পাঁচথুবী গ্রামে বৌদ্ধযুগের পাঁচটি স্তুপ ছিল। স্তূপ কয়টির নামানুসারে এ গ্রামের নামকরণ হয়—"পাঁচথুবী"। পূর্বে কথাটা ছিল 'পাঁচস্তূপী' কিন্তু যেহেতু জনগণ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিতে অনভ্যস্ত, সেইহেতু শব্দটা এখন দাঁড়াইয়াছে "পাঁচথুবী" উক্ত স্তূপগুলিতে নাকি নানা রকমের চিত্র অঙ্কিত ছিল। অধিকাংশ চিত্রই বুদ্ধের জীবনী ও জাতকের গল্প অবলম্বনে অঙ্কিত ছিল, সেইজন্য বোধহয়, লোকে ওগুলিকে বৌদ্ধযুগের স্তূপ বলিয়া থাকে। এখন স্তূপগুলি মাটির নীচে পড়িয়াছে।

পাঁচথুবীর ঠিকানাঃ—
পোঃ—তেরশ্রী
ইউনিয়ন—কলিয়া
থানা—দৌলতপুর
মহকুমা—মানিকগঞ্জ
জিলা—ঢাকা

বৌদ্ধের হস্তীর কিংবদন্তী

পাঁচথুবী গ্রামে পাঁচটি স্তূপ আছে। এখনও বৌদ্ধেরা ঐ স্তূপগুলির দ্বারা সীমিত জায়গাকে বৌদ্ধের পীঠ বলেন। অনেকেই বিশ্বাস করে যে, বৌদ্ধের স্তূপ ধোয়া জল খাইলে রোগ সারে।

বৃদ্ধেরা বলেন, স্তূপকে যদি কেউ অসম্মান দেখায় তবে তার কপালে কিছু না কিছু বালা মসিবত দেখা দিবেই। এ কথা অনেকে মানে, অনেকে মানেনা। লোকে বলে, যাহারা স্তূপগুলির অসম্মান করিয়াছে তাহারা হাতে হাতে ফল পাইয়াছে। তাহাদের একটা না একটা ক্ষতি হইয়াছে। দুই একজন ডান পিঠে যুবক ইহা মানিতে চাহে নাই। হয় তো তাহারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বলিয়া থাকিবে। এসব স্তূপে প্রস্রাব করিলে ঘোড়ার ডিম হয়।

একবার নাকি ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। বহুকাল পূর্বে ঐ অঞ্চলের কোন এক গ্রামে তোতা খোন্দকার নামে একজন লোক ছিল। তার বয়সও অল্প, স্বাস্থ্যও ভাল, সাহসও ছিল খুব বেশী। সে গল্প করিয়া বেড়াইত যে আমি ঐ সমস্ত স্তূপ পূজার ধার ধারি না। ঐ সব করে হিন্দু লোকে, বৌদ্ধলোকে। আমি মুসলমান, আমার স্তূপের ভয় নাই, বিপদে আমার আল্লা ভরসা।

গ্রামের মুসলমান মাতব্বরেরাও তাহাকে বলিল, তোতা খোন্দকার, এখনও তো শরীরে রক্ত গরম। তাই গর্বের কথায় তোমার মুখ ভরা, এদিন থাকিবে না।

বৃদ্ধ লোকদের কথায় তোতা খন্দকার আরো চেতিয়া গেল। সে বলিয়া বসিল আমি পঞ্চ স্তূপের উপর প্রস্রাব করিব। একথা শুনিয়া তাহার মাতা খুব দুশ্চিন্তায় পড়িল। সে পাড়ায় পাড়ায় মাতব্বরদের কাছে ঘুড়িয়া তাহাদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিল, তোমরা আমার তোতাকে আটক করিয়া রাখ, নইলে ওকে আমি বাঁচাইব কেমন করিয়া।

তোতার মাতা আগে আগে অনুরোধ করিয়া যায়, আর তোতা পরক্ষণেই তার পাছ পাছ আসিয়া তোতাপাখীর মত বুলি ঝাড়ে, মাতব্বর চাচারা, আমি মুসলমানের বাচ্চা, বীরের জাতি আমরা, হাতীর দাঁত লড়ে তবু মরদের

বাত লড়ে না; তোমরা আমার মায়ের কথায় ভুলিও না। আমি যাহা বলিয়াছি তাহা করিবই।

তোতা খোন্দকার বড় বেহায়া ছিল। কয়েকজন সমবয়সীদের সম্মুখেই সে পঞ্চস্তূপের একটির উপর প্রস্রাব করিল। সেই দিনই তাহার পুরুষাঙ্গ দিয়া রক্ত পড়িল। তোতা তাহাতে দমিল না। সে আকু হাজামের কাছে গেল। আকু হাজাম খুব শক্ত কবিরাজ ছিল। সে বলিল তোতা, কাজটা তুমি ভাল কর নাই, নিজের ধর্ম নিজে করিও অন্যের ধর্মের প্রতি আঘাত করা ভাল না। আকু হাজামের চিকিৎসায় তোতা খোন্দকার আরোগ্যলাভ করিল। আকু হাজাম বলিয়া গেল, তোতা খোন্দকার, যাহোক, আল্লার রহমতে এযাত্রা রক্ষা পাইলে। কিন্তু আমি তোমাকে বারন করি, আর কখনও এমন কাজ করিও না, আর একটা কথা, কখনও বেশী রাত্রে একাকী চলিও না।

ইহার পর হইতে তোতা খোন্দকার আর পঞ্চস্তূপের উপর অসম্মান দেখানের সাহস পায় নাই। কিন্তু তোতা ছিল দুরন্ত সাহসী যুবক। রাত্রিতে সে একাই চলা ফেরা করিত, ভয় কাহাকে বলে তাহা সে জানিত না।

একদিন সে নাকি নিজ গ্রাম হইতে বারো মাইল দূরে বাইস্তাজান নামক গ্রামে গিয়াছিল বিশেষ কোন প্রয়োজনে। সে ছিল পটু ঘোড় সোওয়ার। তাহার মনে এই ভাব, ঘোড়ায় চড়িয়া যাইব। ইহাতে আর চিন্তার কি আছে। এক প্রহর রাত্রি করিয়া রওয়ানা না হইলেই কি আসে যায়। ছুঃ-এর আগে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া যাইব।

সত্যই তোতা খোন্দকার রাত্রি করিয়া বাড়ী রওয়ানা হইল। তাহার যে পঞ্চস্তূপের পাশ ঘেসিয়া বাড়ী যাইতে হইবে ইহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। তার মনে আছে অদম্য সাহস।

পঞ্চস্তূপের কাছেই একটা হিজুল গাছ আছে। হিজুল গাছের কাছে তোতা খোন্দকার যখন আসিয়াছে তখন রাত দুপুর। হিজুল গাছের গোড়ার দিকে তোতার যখন নজর গেল তখন তাহার গাঁয়ের লোম কাঁটা দিয়া উঠিল। সে দেখিয়াছিল যে প্রকাণ্ড একটা হাতী তাহার দিকে পিছন ঠায় বসিয়া রহিয়াছে।

তোতা ভাবে—মরিয়াছিই তো, কিন্তু পড়িয়া মরিব না। সে তখন মরিয়া হইয়া ঘোড়ার পাছায় খুব জোড়ে তিনটা বাড়ী দিল আর উহার দুই পার্শে দিল দুই কাঁতা[১]। ওহ্, ঘোড়া যে ছুটিল কিনা তা যতদূর বেগ ওটার ছিল। সম্মুখে ছিল একটা বাঁশের ঝাড়। ঝাড়টা পথের উপর বাঁকিয়া আসিয়াছিল। সেই বাঁশ ঝাড়ের ঝাপ্‌টা লাগিয়া তোতা খোন্দকার ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া গেল।

এক পা এক পা করিয়া হাতীটা আগাইয়া আসিল। হাতী মানুষের মত কথা কহিল। সে কহিল, তোতারে বাছা, আমরা বৌদ্ধের দাস, অন্যায় করার হুকুম আমাদের নাই, তবে কিযে, প্রভুর সম্মান তো রক্ষা করিতে হইবে, তাই তোমাকে দেখা না দিয়া পারিলাম না। তোমার কোন ভয় নাই, তুমি সাহসী ছেলে, তোমার ক্ষতি হইবে না। ইহা বলার পরেও তোতার সর্ব শরীরে ঘাম দেখা দিল। তখন হাতী শুইয়া পড়িয়া তোতাকে উহার কানের সহায়তায় বাতাস করিতে থাকে। বাতাস তোতার কতটুকু কাছে আসিতেছিল জানিনা, কিন্তু হাতীর নৈকট্য লাভের দরুন সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল।

আবার আকু হাজাম তোতাকে ভাল করে।

১। লাথি দেওয়া।

মাচানের মিয়াবাড়ীর কিংবদন্তীর পূর্বাভাষ

মাচানের মিয়াবাড়ীর আভিজাত্যের খবর এ অঞ্চলের প্রায় সকলেই রাখে। ওখানকার সৈয়দ বংশের কুল গৌরবের কথা মানুষ যেমন পঞ্চমুখে বলে তেমনি তাঁহাদের অমানুষিক অত্যাচারের কথাও লোকমুখে বহুল প্রচারিত।

লোকে বলে তাঁহারা দিল্লীর সৈয়দ আবদুল্লা খাঁর বংশধর। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ প্রায় পৌনে তিন শ বৎসর পূর্বে এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। দিল্লীর সিংহাসন লইয়া কাড়াকাড়ির সময় সৈয়দ আবদুল্লা খাঁর এক বংশধর পলাইয়া মাচানে চলিয়া আসেন। কথিত আছে যে, এই বংশের লোকের মানুষের প্রতি আস্থা ছিল না। তাহারা নাকি বলিত, জীবনে কাহারও উপকার করিতে নাই। কাহারও উপকার করিলে নিশ্চয় সে প্রতিদান স্বরূপ তাহার অপকার করিবে।

তাঁহারা খেয়াল খুশীতে মানুষ হত্যা করিয়া গুমখানার কূপে ফেলিয়া দিত। খেয়ালের বশবর্তী হইয়া তাহারা বহু গর্ভবতী নারীদের হত্যা করিয়া তাহাদের পেট চিরিয়া দেখিত। কেমন করিয়া সন্তান মায়ের গর্ভে অবস্থান করে। আজও এই বাড়ীতে (বিস্তৃত প্রায় ৫০ একর) সেই গুমখানার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। আর আছে একটি মস্‌জিদ (তাহার ভিতর আরবী হরফের একটি শিলা লিপি) একটি ইঁদারা, কয়েকটি ফটকের ভগ্নাবশেষ, পুষ্করিনী ও পরিখার চিহ্ন।

এই বাড়ীকে মানুষ মাচানের মিয়াবাড়ী, মুন্সীবাড়ী বা নওয়াব বাড়ী বলিয়া থাকে।

ঠিকানা—

গ্রাম—মাচাইন

ইউনিয়ন—আরোয়া

থানা—শিবালয়

মহকুমা—মানিকগঞ্জ

জেলা—ঢাকা

মাচানের মিয়াবাড়ীর কিংবদন্তী

ছোটকালে বুইড়্যা মাইনষেগো[১] কাছে আমরা মাচাইনের মুন্সীবাড়ীর অনেক গল্প শুন্‌চি। তানরাও তান্‌গো[২] মুরব্বিগো[৩] মুখে এইসব[৪] গল্প শুন্‌চিলেন। নিজ্যা চক্কে[৫] হ্যাখার মইধ্যে খালি[৬] কতগ্‌গুলি ভাঙ্গা চুইড়া দালান কুঠা দেখ্‌চি ছোট কালে। আর একটা ছেকল দেখ্‌চি। উডা[৭] পুকুইরে ফালাইন্না[৮] আছিল। উইয়্যার[৯] এক মাথা পুকুইরের পাড়ে একটা বট গাছের সাথে বান্দা[১০] আছিল। সে বট গাছটা এখনও আছে। কিন্তুক[১১] সেই পুকুইর্‌টা ভরট পইড়্যা গেছে।

আমরা সক[১২] কইর‍্যা সেই ছেকল[১৩] ধইর‍্যা কত টানাটানি করছি—ছেকলডা[১৪] খুবই মোটা, ওডা[১৫] দশ বার হাত পরিমাণ টানে উইঠ্যা আইচে আর বেশী উঠে নাই।

সেই কালানে[১৬] জমিল[১৭] ফকীর নামে এক ফকীর আছিল। জমিল ফকীর নামকরা গুনিন. সে সৈয়দ বাড়ীর ভিটার চাইতে পরায় পাখী দুই[১৮] দূরে আর একটা শুইন্যা[১৯] ভিটায় থাক্‌তো।

সৈয়দ সাবের অত্যাচারের চোটে যখনে অনেকে ভিটা গাটা ফালাইয়া থুইয়া দূর দূরান্তে অন্য রাজার হ্যাশে ম্যালা দিল, তখনে সেই জমিল ফকীর একদিন সৈয়দ সাবের কাছে গেল। সে যাইয়া লওয়াব[২০] সাবেরে কইল, হ্যাখেন আল্লা আপনারে বহুত ধন দৌল্যাত মাল মাত্তা দিয়্যাছে, আল্লার দিনে[২১] চাইয়া আপনে একটু শান্ত হন। হ্যাখেন কার এত ভাগ্য যে পাঁচ পাঁচা পচিশটা হাত্তী[২২] আর শতাধিক ঘুড়া থানে বাইন্দ্যা খাওয়ায়। আল্লা

১। মানুষদের ২। তাঁহাদের ৩। মুরব্বিদের ৪। এই সকল ৫। চক্ষে ৬। শুধু ৭। ওটা ৮। ফেলিয়া রাখা ৯। উহার ১০। বাঁধা ১১। কিন্তু ১২। সখ ১৩। শিকল ১৪। শিকলটা ১৫। ওটা ১৬। কালে ১৭। সাধনায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত ১৮। ছেষট্টি ডিসিমেল ১৯। জনমানবহীন ২০। নবাব

আপনার দিরে[২৫] মুখ তুইল্যা চাইচে[২৫] আপনে ক্যানে গরিবের দিরে[২৬] ফিরা চাইবেন না। যুদি এতই নিদয় নিষ্ঠুর হুন, খালিই যুদি মানুষ কাইট্যা কাইট্যা গুমখানা বোঝাই করেন তয়[২৮] আল্লা ইয়ার[২৯] বিচার কইর্‌বো[৩০]।

যাহামাত্র ফকীর এই কথা কইচে[৩১] তাহামাত্র লওয়াব সাব পায়ের জুইত্যা[৩২] খুইল্যা ফকীরের মুখ বরাবর ফেইক্যা[৩৩] দিচে।

জীবনে ফকীর আর কুনদিন এতখানি অপদস্ত হয় নাই। চেরকাল[৩৪] মানুষ তার পায়ের ধূলি নিচে—তাতে কতজুনের[৩৫] কত ব্যারাম সারচে[৩৬] সে একজন কামেল ফকীর, আউলিয়া লোক।

জুইত্যার বাড়ি খাইয়া ফকীর হাউমাউ কইর‍্যা কাইন্দ্যা দিল। কিন্তু পাষণ্ড লওয়াবের[৩৭] কুন[৩৮] দয়ামায়া নাই। তখনে ফকীর ঐ জুইত্যা হাতে তুইল্যা উপরে উইঠিয়া আল্লার দরবারে মোনাজাত কল্ল।

ইয়ার কয়াকদিন[৩৯] পর, হঠাৎ একদিন মানুষেরা ছ্যাখে সেই আউলিয়া আর সেই ভিটায় নাই।

তার পরের দিনই সকাল বেলা লওয়াব বাড়ীতে এক বেষম[৪০] কাণ্ড। লোক লস্কর আন্দি-বান্দি সবেই বাড়িভর যুইলাযুলি[৪২] কইর্‌ত্যাছে। তাগো[৪৩] বিষম চিন্তা। লওয়াব বাড়ীর কুন মানুষ ঘুমে থ্যা[৪৪] উঠেনা। কের্‌মেশ[৪৪] বেলা দুপুর গইড়্যা[৪৬] গেল। তাও যখনে কেউ ঘুমে থ্যা উঠেনা তখন ছাওনজী কয়, আর ডরাইয়্যা থাইক্যা কি অইবো[৪৭], নাজানি কুন অমঙ্গল ঘইট্যাছে। ঘরের কপাট ভাইঙ্গ্যা ফালাও।

রংমহলের কপাট ভাইঙ্গ্যা ছ্যাখে যে লওয়াব সাব মইর‍্যা রইচে, ব্যাগমও[৪৯] মারা গেছে পুলাপান সবই মারা পড়্‌চে।

২১। দিকে ২২। হাতী ২৩। বাঁধিয়া ২৪। দিকে ২৫। চাহিয়াছে ২৬। দিকে ২৭। শুধু ২৮। তবে ২৯। ইহার ৩০। করিবে ৩১। কহিয়াছে ৩২। জুতা ৩৩। ছুড়িয়া দিয়াছে ৩৪। চিরকাল ৩৫। কতজনের ৩৬। আরোগ্য লাভ করিয়াছে ৩৭। নবাবের ৩৮। কোন ৩৯। কয়েকদিন ৪০। ভীষণ ৪১ বাঁদি ৪২। হট্টগোল ৪৩। তাহাদের ৪৪। হইতে

তখনে তারা লওয়াবের ছেইলা-পেইলাগো ঘরের দরজা ভাইঙ্গ্যা স্থাখে সবেই মারা পড়চে—লওয়াব গুষ্টির ছোপের পুয়াডা[৫১] নাই—সবই মারা পড়চে।

কিছুদিন পর এই খবর পায় মুর্শিদাবাদের লবাব। এ বাড়ীর ধন দৌলাত লবাব সরকারে লইয়া যাইব্যার জইন্যে তান[৫২] এজাগায় লোক-লস্কর পাঠাইয়্যা স্থান।

লবাবের লোকজনেরা বহুত ধন-দৌলাত এ বাড়ীর দালান কুঠা খুইজ্যা বাইর কইল্ল। তার পরে তাগো[৫৩] চোখ পইল তালাপের মইদ্দেকর সেই ছেকলডার[৫৪] উপর। বহুত লোকজন মিল্যা[৫৫] পরায় একদিন ভইর্যা সেই ছেকল টাইনল কিন্তুক কুন ফয়দা হইল না। শ্যাষে মুর্শিদাবাদের লবাবের লোকজনেরা মুন্সিবাড়ীর লোকজনের উপর সন্দে[৫৬] কল্ল যে তারা ইচ্ছা কইর্যা বেশী টানে নাই, এমনকি তাগো[৫৭] কতক মানুষ উইল্টা[৫৮] টান দিচে।

পরের দিন তারা ঐ তালাপের পাড়ে চাইরডা[৫৯] কাঠ গাইড়ল,[৬০] তার সাথে ছিকল বাইন্দ্যা চাইর হাত্তী স্থ্যা[৬১] ছেকল টানাইল। এক নাস্তার[৬২] বেলা পর্য্যন্ত টানাটানি কইর্যাও কুন কুল পাওয়া গেল না। স্থাখা গেল তালাপের মইধ্যে পানি ভল্‌কা ভাইঙ্গ্যা উঠ্‌পার[৬৩] নাগ্‌ল। পানি আছিল পাড়ের দশ হাত নীচে। ভল্‌কা ভাইঙ্গতে ভাইঙ্গতে সেই পানি পাড় ছো ছো কইর্যা ফুইল্যা উট্‌ল। ছেকলে এছা জোর টান পইল যে চাইর কাঠ ভাইঙ্গ্যা চাইর হাত্তী তালাপে পইড়্যা গেল। হাত্তী গুইল্যা কুন রকমে হাবু-ডুবু কইর্যা ডাঙ্গায় উইঠ্যা আইল।

এসল[৬৪] ঘটনা দেইখ্যা মুর্শিদাবাদীরা কুন স্থমায় তালাপের পাড় থ্যা পিট্‌ঠা নুরাইয়্যা গেছে।

খুবই গরম পড়্‌ছে। সন্ধ্যার স্থমায় চাইরজন মুর্শিদাবাদী ডাব পাইরব্যার গেছে। বহুত নাইড়কোল গাছ বাড়ী ভরা। নীচে তিনজন খাড়াইয়া

৪৫। ক্রমশঃ ৪৬। আক্রান্ত হইয়া গেল ৪৭। হইবে ৪৮। ভাঙ্গিয়া ফেলা ৪৯। বেগম সাহেবাও ৫০। ছেলেদের ৫১। অঙ্কুরটি ৫২। তিনি ৫৩। তাহাদের ৫৪। শিকলটির ৫৫। মিলিয়া ৫৬। সন্দেহ ৫৭। তাহাদের ৫৮। বিপরীত দিকে ৫৯। চারিটি

নইচে আর একজন গাছে উঠ্‌চে। গাছে থ্যা[৬৭] ও ব্যাটা ডাব ছিড়্যা স্থায় নীচের কয়জনে খুটে পাইড়্‌তে পাইড়্‌তে গাছের সগ্‌গল[৬৮] ডাব পাইড়্যা ফালাইল।

এখন সে ব্যাটা গাছ থ্যা নামবো। সে কিছুদূর নামে আবার ক্যারাজুনি[৬৯] তার হাত ধইর‍্যা টান স্থা[৭০] গাছের ডালের কাছে উইঠিয়া[৭১] দেয়। আবার সে নামে, আবার ক্যারাযুনি[৭২] তার হাত ধইর‍্যা টান স্থা গাছের মাথার কাছে উইঠ্যায়।

সে কোন মানুষজন স্থাখে না। নীচে থ্যা[৭৩] তার সাথীরা কয়, নামতো না, কি অইল[৭৪]। ভয়ের চোটে গাছে চড়ুইস্থার[৭৫] গলা সুইকিয়া গেছে। খুব কষ্টে চিষ্টে সে কইল, আমারে, নাইমব্যার স্থায় না তো, নামি কেমনে, ক্যারা যুনি হাত ধইর‍্যা টাইনা উপরে উইঠ্যায়।

ইয়া[৭৬] শুইন্যা নীচের তিনজন নুড়াইয়া[৭৭] পলাইল। তখনে গাছি স্থাখে ছফেত ধলা দাড়িয়ালা একজন[৭৮] মানুষ নাইড়কোল গাছের মাথায় বইস্যা তারে টানে আবার ছাড়ে, আবার টানে। সে কইল এতই রাক্কস জাতি যে জড়-পেইচ্যা[৭৯] চাবাইয়া খাইব্যার চাস্। এত ধন দৌলাত নিলি[৮০] তাও তগো[৮১] সখ মিট্‌ল না। আবার হাস্তী স্থা[৮২] ছেকল টানালি। আইচাস ডাব খাইবার দুই চাইরডায়[৮৩] হয় না, গাছের কোল খালি কইর‍্যা[৮৪] সবগুলি পাড়্‌লি। আয় ব্যাটা তরে কিছু অছিমত[৮৫] দিয়া দেই। এই কইয়া সে তার হাত ধইর‍্যা শুন্য কইর‍্যা নীচে ফালাইয়া দিল। একুই[৮৬] আছারে তার সারা— দম বাইরিয়া গেল। সেই থিক্যা[৮৭] ও বাড়ীর জিনিষ ক্যাও[৮৮] ছুইব্যার চায় না।

৬০। পুঁতিল ৬১। দিয়া ৬২। সকালের ৬৩। উঠিতে লাগিল
৬৪। এই সকল ৬৫। হইতে ৬৬। রহিয়াছে ৬৭। হইতে
৬৮। সকল ৬৯। কে যেন ৭০। টানিয়া ৭১। উঠাইয়া
৭২। কে যেন ৭৩। নীচ হইতে ৭৪। হইল ৭৫। আরোহন করা
৭৬। ইহা ৭৭। দৌড়াইয়া ৭৮। একজন ৭৯। মূলসমেত ৮০। লইয়াছিস ৮১। তোদের ৮২। হস্তী দ্বারা ৮৩। চারিটায় ৮৪। শূন্য করিয়া ৮৫। সমুচিত শিক্ষা ৮৬। একটি মাত্র ৮৭। হইতে
৮৮। কেহ।

পাবনা

পাবনা জেলা থেকে যাঁরা কিংবদন্তীগুলো সংগ্রহ করেছেন তাঁদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে দেয়া হলো :

(ক) বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব জাহাঙ্গীর খান ইউসুফজাই "শয়তানের পাড়া', 'গোয়ালন্দ', 'খুনীপাড়া', এই তিনটি কিংবদন্তী সংগ্রহ করেছেন। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম : রেহাইপুকুরিয়া ডাকঘর : মিরকুটিয়া, জেলা : পাবনা।

(খ) বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব আবদুস সোবহান 'গুরমার মেলা' কিংবদন্তীটি সংগ্রহ করেছেন। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম : বড়গোঁজা, ডাকঘর : সলংগা, জেলা : পাবনা।

গুরমার মেলা

পাবনা জেলার তারাশ থানার অন্তর্ভুক্ত গুরমা গ্রামে আজকের এই আধুনিক শিক্ষার যুগেও স্কুল কলেজের ছাত্রের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

গ্রামটি ছোট। কিন্তু প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় মাত্র একদিনের জন্য যে মেলার আয়োজন হইয়া থাকে, তাহা এতদাঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ মেলা। আনুমানিক দুই লক্ষ টাকার বিভিন্ন মালপত্র এই মেলায় বিক্রয় হইয়া থাকে।

উত্তরে রংপুর ও পশ্চিমে রাজশাহীসহ বহু দূর-দূরাঞ্চল হইতে অগণিত মানুষ এই মেলায় আগমন করে। অনেকে পথে প্রবাস থাকিয়াও পরদিন এই মেলায় হাজিরা দেয়। অতীতের কোন কর্তৃপক্ষের কৌশলগত কারণেই হউক, অথবা প্রদর্শিত কিংবদন্তীতে বিশ্বাস করিয়াই হউক, এখানে বহু মানুষ আসে। মালপত্র বহনকারী শত শত গরু মহিষের গাড়ী যখন চারিদিক আছন্ন করিয়া ধূলা-কাদা উড়াইয়া মেলামুখী হয় তখন সে দৃশ্য কতই না দেখিবার মত।

জনশ্রুতি রহিয়াছে, পূর্বেকার দিনে পূর্ব-দক্ষিণ পার্শ্বের ঐ অন্ধ পুকুরের পাড়ে যে তালগাছ দুইটি রহিয়াছে, কোথা হইতে প্রত্যেক রাত্রিতে লম্বা পুচ্ছবিশিষ্ট এক বিরাট অগ্নি-মূর্তি নাকি তাহাতে ভর করিত। কিছু সময় পর আবার পাখীর মত উড়াল দিয়া চলিয়া যাইত। যাইবার এবং আসিবার সময় যে প্রবল ঝটিকা প্রবাহের সৃষ্টি হইত তাহাতে ঘুমন্ত ব্যক্তি-রাও নাকি জাগিয়া যাইত। শন্ শন্ শব্দে প্রবাহিত সেই বায়ুর গতিবেগ এত নাকি বেশী ছিল যে, কাঁচা কাঁচা কুঁড়ে ঘরগুলি মট্ মট্ করিয়া শব্দ করিত। ভীত সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীরা বহুদূর হইতে খ্যাতনামা অনেক দান্দুড়ী (যাহারা ভূত-পেত্নীর চিকিৎসা করে) কবিরাজ ডাকিয়া আনিয়া ইহার সুরাহা করিতে চাহিয়াছে। আগত কবিরাজ তাহার নানারূপ ক্ষমতার

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়া অতঃপর বুক ফুলাইয়া কাজে হাত দিয়াছে। কিন্তু ব্যর্থ হইয়াছে সবাই। ব্যর্থই শুধু হয় নাই, নিজেদের প্রাণও হারাইয়াছে। নিজ নিজ পদ্ধতি মত ঝাড় ফুঁক করিয়া গাছে পানি ও চাউল পড়া ছিটাইয়া এবং এমনি অনেক প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করিয়া যখন তাহারা চেষ্টা চালাইয়াছে, তখনই আসিয়াছে এই মূর্তি। কেহই বাধা দিতে পারে নাই। বসিয়াছে ঐ তাল গাছের মাথায়। তারপর আবার গ্রাম কাঁপাইয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু পরদিন ফকিরের গায়ে কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসিয়াছে। দুই চারদিন মৃত্যুর সংগে যুদ্ধ করিয়া বিদায় হইয়াছে ফকির। গ্রামবাসীদের সকল চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হইয়া গেল তখন যে যে দিকে পারিল গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল। যাহারা পারিল না তাহারাই কেবল অগত্যা সাহস সঞ্চয় করিয়া প্রতিবিধানের সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

অতঃপর একদিনের ঘটনা। সেই অঞ্চলে নাকি জনরব ছড়াইয়া পড়িল যে বগুড়া জেলার মহাস্থান নামক স্থানে (মাজারে) এক কামেল পীর আগমন করিয়াছেন। অসম্ভব বলিয়া কোন কাজই তাঁহার কাছে নাই। পথের ধুলা বালি তাহার একমাত্র আহার্য। উলংগ প্রায় সেই দরবেশের পায়ে একদিন মাথা রাখিল গ্রামবাসী। দুঃখ বেদনা নিবেদন করার পর পীর বাবা সাহস দিয়া জানাইল এক সপ্তাহ পর তিনি শুরমায় আসিয়া ইহার একটা বিহিত করিয়া যাইবেন।

ভরসাপ্রাপ্ত গ্রামবাসীরা গ্রামে আসিয়া দেখিল, সেই দীর্ঘদেহী মুখভর্তি মেহেদী রাংগা দাঁড়ি বিশিষ্ট দরবেশ গ্রামের মসজিদে বসিয়া একটানা জিকির করিতেছেন। সকলেই অবাক। অবাক হইল এই কারণে যে, পরদিন যাহারা বগুড়া হইতে বাড়ী আসিয়াছে তাহারা নাকি বগুড়াতেই (মহা-স্থানে) তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছে।

যাহা হউক, তিনি সমস্ত গ্রামবাসীকে বন্ধ ঘরে রাত্রি যাপনের হুকুম দিয়া তাহার জহুরা জাহিরে তৎপর হইলেন। শন্ শন্ করিয়া গ্রাম পাড়া কাঁপাইয়া যখন সেই আলোটি আসিয়া উপস্থিত হইল তখন অন্যান্য দিনের মত এক গাছে না বসিয়া মানুষের মূর্তি ধারণ করিয়া দুই গাছে

দুই পা রাখিয়া দাঁড়াইল। তারপর গ্রামবাসীরা শুধু একটি গগনভেদী হুঙ্কার মাত্র শুনিয়াছে। তাহার পর সব নীরব। লোকজন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল এই মনে করিয়া যে, এইবার তাহাদের মনের মকসুদ বোধ হয় পূর্ণ হইল।

পরদিন দেখা গেল, তালগাছের গোড়ায় পড়িয়া আছে একখণ্ড রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড। তাহা দেখিয়া মনে হইয়াছে, কোন একটি মানুষকে পাটায় পিষিয়া ছানা করা হইয়াছে। কেহ ভাবিল, ইহা সেই পীর সাহেবের দেহ। কেহ মনে করিল, দৈত্যের। কেহবা, দুয়েরই।

ইহার পর হইতে গ্রামবাসীদের চোখে কখনও এ আলো আর চোখে পড়ে নাই। শন্‌ শন্‌ শব্দ শুনে নাই। কিন্তু পূর্ব পার্শ্বের এই মাঠে নিশুতি রাত্রিতে কে নাকি কখনো কখনো কাঁদিত। কখনও আল্লাহু আল্লাহু করিয়া জিকির করিত। প্রথমদিকে অঞ্চলবাসীরা এইখানে শিরনি ও ধর্মসভার মাধ্যমে এই বিপদ হইতে মুক্তি চাহিয়াছে। ফল হয় নাই। অতঃপর জনৈক লোক নাকি স্বপ্নে দেখে যে, তাহার (পীরের) মৃত্যু তারিখে বৈশাখী পূর্ণিমায় প্রতি বৎসর এখানে মেলা বসাইতে হইবে। তাহার পর হইতে তাই বসে। এত লোক সমাগম কোথাও একটা দেখা যায় না। এত লোক সমাগমের আরও একটি কারণ আছে। শোনা যায়, পেটের বেদনার রোগী এই মেলার মাটিতে পা রাখিলে ও পায়ের তলায় মাটি লইয়া তাবিজ করিলে পেটের বেদনা নাকি সম্পূর্ণ নির্মূল হইয়া যায়।

শয়তানের পাড়া

মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখাঁ উপজেলার অন্তর্গত টেলিবাশাইল ইউ-নিয়নের অন্তর্গত ইহা একটি গ্রাম। ইংরেজ রাজত্ব কায়েমের প্রাথমিক অবস্থায় তাহাদের শাসনকার্যের সুবিধার নিমিত্ত যে সমস্ত এলাকায় অনুগত হিন্দু জমিদার নির্বাচিত করা হয় ইহাও তদ্রূপ একটি এলাকা সংলগ্ন বা অন্তর্ভুক্ত বিশেষ একটি গ্রাম বা স্থান এবং যে স্থানের পূর্বাপর ইতিহাস বহুকাল অবধি সকলের জ্ঞানের বাহিরে ছিল। যাহার সত্যাসত্য সম্পর্কে বাস্তব ঘটনার সমন্বয় আজিও আমাদের মনে নানা কৌতুহলের সৃষ্টি করে। বিস্ময়ের ভাব জাগায়।

শয়তানের পাড়া, গ্রাম বা স্থানটি আদতে কোন একটি বসতি বিরল স্থান বিশেষ। ইহার সঙ্গে তৎকালীন সময়কার জন-মানুষের কোন রূপ সম্পর্ক সংস্থাপিত হইত না। যাহার প্রয়োজনে, যাহার গুরুত্ব একমাত্র তৎকালীন সময়কার রাজা, মহারাজা বাদশা জমিদারগণই সবিশেষ অবহিত থাকিতেন।

ব্রিটিশ শাসনের মানচিত্রে আমরা দেখিতে পাই, এই এলাকাটি এই নামেই চিত্রিত হইয়াছে কিংবদন্তীর এক বিশেষ উপাদান হিসাবে বিস্ময়ের এক বিশেষ বস্তুরূপে।

আমাদের আলোচ্য শয়তানের পাড়া গ্রামটি একটি ঘটনা সমৃদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামের নাম হিন্দু রাজাদের আমলে ছিল একরূপ, মোঘল আমলে ছিল আর এক রূপ, অতঃপর ইংরেজ আমলে আসিয়া পুনরায় পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে।

হিন্দু রাজাদের আমলে উহা ছিল বিখ্যাত এক শ্মশান ঘাট। যাহার চিতা ভস্ম বুকে লইয়া তখনকার বুড়ীগঙ্গার একটি শাখা উহার পাদদেশ ধৌত করিয়া সগৌরবে প্রবাহিত হইত। অথচ আজ যাহার বুকে গড়িয়া উঠিয়াছে অসংখ্য পাড়া, গ্রাম-গঞ্জ, হাট-বাজার, ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত এই সমস্ত এলাকাতে ছিল তখন অনেক হিন্দু, সাধু-সন্নাসী, মুনি ঋষিদের

আশ্রম। শোনা যায়, অনেক হিন্দু নরপতিদের নশ্বর দেহ এককালে এখানে জাঁকজমকের সঙ্গে দাহ করিয়া তাহাদের চিতার উপর অনেক মূল্যবান মঠ-মন্দির অনেক অর্থব্যয়ে নির্মাণ করা হয়।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অনেক সদস্যেরই মৃতদেহ নাকি এখানে এই এলাকাতে দাহ করা হয়। অতঃপর শেষ হিন্দু নরপতি বল্লাল সেনের মৃতদেহও নাকি এখানেই একদিন স্ব-গৌরবে দাহ করা হয়। তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই শুরু হইতে থাকে এদেশের মাটিতে মুসলিম অভিযান। এদেশের গণ-মানুষের ভাগ্যাকাশে নূতন এক সভ্যতা নূতন এক সংস্কৃতি ঐতিহ্যের ধ্বজা উড়াইয়া এদেশের মাটিতে বুনিয়াদ কায়েম করে নূতন এক আদর্শ নূতন এক সভ্যতার।

এইরূপে আসমুদ্রহিমাচল যখন সমগ্র মুসলিম রাজা বাদশাহের করতলগত হয়, তখন তাহাদের পূত শুদ্ধ ঐতিহ্য সমৃদ্ধ সাহিত্য সংস্কৃতির তাহজিব তমুদ্দনের ধারক এবং বাহক স্মৃতি বিজড়িত অনেক স্থান, গ্রাম গঞ্জ, হাট-বাজার নদী-বন্দর শহরের নামের আমূল পরিবর্তন করিয়া তথায় নিজেদের বিজয় বৈশিষ্ট্যে উহাদের নামকরণ করেন। যাহা আজিও সেই বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন ধারণ করিয়া স্ব-মহীমায় বিরাজমান।

শয়তানের পাড়া গ্রামটি সেইকালের এক কু-কীর্তির স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া মুসলিম শাসকবর্গ উহার ঐরূপ নামকরণ করেন। বিশেষ করিয়া মোঘল বাদশা সম্রাট আলমগীরের আমলেই নাকি ঐরূপ নামকরণে অভিহিত করা হইয়াছে। ধর্মীয় মতে, এই এলাকায় নানা ধরনের ধর্মবিরোধী কার্যকলাপ সংঘটিত হওয়ায় তাহার সুবেদারগণ ইহাকে এই নামে অভিহিত করিয়া ইহাকে এই দেশের মাটিতে এক কলংকের চিহ্নরূপে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। যাহাকে ইসলাম ধর্মীয় মতে শয়তানের আখড়া বলিয়া বিবেচনা করা হয়।

মোঘল আমলের চরম উন্নতির যুগে যখন ধর্মীয় গোঁড়ামীর অনুশাসনে এতদ্ এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সত্ত্বেও হিন্দু জনগণ তাহাদের পিতৃ-পুরুষদের ধর্মীয় মতামতকেই আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছিলেন। তখন তাহাদের সেই মনোবৃত্তির কার্যকলাপকে ইসলামী ধর্মমতে নাপাক এবং নাজায়েজ বলিয়া উল্লেখ করেন—সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশের

এই এলাকায় তখন হিন্দু জনগণ অত্যধিক পরিমাণে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। শোনা যায়, তাহারা নাকি তখন এতদ্ এলাকায় দেবতাদের বাসস্থান বলিয়া বিভিন্ন উপাসনালয় বিভিন্ন দেবালয় তৈরি করিয়া উহার পূজা অর্চ্চনা করিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতঃ মুনি ঋষি-রূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

দীন ইসলামের হুকুম আহকাম যখন মর্ত্যের আলোক বর্তিকা জ্বালাইয়া বাংলার এই অন্ধ বিশ্বাস এবং নানাবিধ গোঁড়ামি কুসংস্কারের বিন্ধ্যাচল উলঙ্ঘন করিয়া অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতে থাকিল, তখন এই সমস্ত গোড়া হিন্দু সম্প্রদায় স্ব-স্ব মান সম্মান লইয়া ভারতবর্ষের যত্রতত্র ছড়াইয়া ছিটাইয়া পড়িতে লাগিল। উহাদের একদল আসামের বর্তমান কামরূপ জিলা এবং অন্য আরেক দল ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন মতে এবং পথে সরিয়া যাইয়া তাহারা তাহাদের জাতিগত ব্যবসা চালাইয়া যাইতে শুরু করে। তথাকার বর্তমান হিন্দু সমাজ সেই কালের সেই হিন্দু সম্প্রদায়েরই ভাবী বংশধর বলিয়া মনে করিলেও করা যাইতে পারে। নগণ্য যাহারা ছিল তাহারা তখন তাহাদের পূর্ণ আধিপত্য বিস্তারের সকল উপায় প্রয়োগ করিবার যথেষ্ট সুযোগ করিয়া লয়। কিন্তু তাহাদের সেই সুযোগ সম্পূর্ণরূপে কর্যোপযোগী করিয়া লইবার পূর্বেই ঢাকা অঞ্চলে নবাব ও সুবেদার নিযুক্ত হইয়া আসিতে লাগিল দিল্লীর খাস দরবার হইতে। যাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার মানসে এই সমস্ত হিন্দু জনগণ একে একে ক্রমান্বয়ে সরিয়া যাইতে থাকিল। তাহারা আদতে ছিল মুসলমান বিদ্বেষী এবং নানা দেবদেবীর পূজক। নানা দেবদেবীর পূজা অর্চ্চনাতেই তাহারা সমধিক সন্তুষ্টি লাভ করিত।

তাহা ছাড়া, এখানে অন্য আর এক শ্রেণীর সম্প্রদায় বাস করিত। যাহারা মন্দিরস্থ ধ্যান মগ্ন মুনি ঋষিদের সেবায় সর্বদা নিয়োজিত থাকিত। তাহারা এই এলাকায় ছোট ছোট কুটির নির্মাণ করিয়া স্ব-পরিবারে বসবাস করিত। নিজ স্ত্রী-পুত্র কন্যাদিগকেও পর্যন্ত তাহারা দেবদেবীর মন্দির উপাসনালয়ের বিভিন্ন সেবায় নিয়োজিত করিত। সম্রান্ত হিন্দু জনগণ চলিয়া যাইবার পরে এখানে তাহারা দাস, কৈবর্ত, নমঃশূদ্র, ইত্যাদি খেতাবে ভূষিত

হইয়া তৎপরবর্তীকালে নবাগত মুসলিম জাতির বিজীত প্রজা হিসাবে এখানে বসবাস করিতে থাকে। মন্দির এবং দেবদেবীর উপাসনালয়গুলি তখন শূন্য পড়িয়া থাকে। আগাছায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইতে থাকে উহার চতুর্পার্শ্বস্থ অঙ্গনগুলি। নঙ্গরানা-ভেট আসিবার সমুদয় পথগুলি একে একে বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া যাইতে থাকিল। তখন এমনকি উহা একদিন একেবারে বন্ধ হইয়া গেল এই লোকসভার অভাব হেতু।

দেব মন্দির সমূহের উচ্ছিষ্ট ভোগকারী এই সমস্ত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু জনগণও একদিন উপায়ন্তর না দেখিয়া গ্রাম্য কৃষকদের মত লাঙ্গল জোয়াল কাঁধে লইয়া মাঠের কাজে নামিয়া পড়ে। যাহার ফলে এই এলাকা মনুষ্য বসোপযোগী বলিয়া আর বিবেচিত হইতে পারিল না। উহা তখন শূন্য প্রেতাত্মার আবাস ভূমি বলিয়াই পরিগণিত হইতে থাকিল।

যেখানে দিন দুপুরে কাক ডাকিতে ভয় পাইত, যেখানে জঙ্গলে লুকায়িত থাকিত বিষধর সর্পরাজ, যেখানে বাতাস বহিয়া লইয়া যাইত নীরব এক মৃতপুরীর নিঃশব্দ ইতিহাস। দিনের রৌদ্রে যেখানে ছায়া ফেলিতে কুণ্ঠা বোধ করিত, যেখানে তরুলতা গুল্মপর্ণের মর্মর ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইত প্রতিদিন অসংখ্য মানবতার কাতর যন্ত্রণা। অনেকেই অনুমান করেন, উহা আর কিছুই নহে, উহা কেবলমাত্র তৎকালীন সময়কার মুসলিম কর্তৃক বিজীত হিন্দুদের মৃতদেহ সংস্থানের এক বিশেষ নির্দিষ্ট জায়গা। ফলে কেহই উহাতে ভুলিয়াও কোনদিন হস্তক্ষেপ করিতে প্রয়াসী হয় না। ভূতপরস্ত মানুষের মনে বিজয়ী মুসলমান নরপতিগণ এইরূপ একটি ধারণার জন্ম দিয়াই হয়তো বা তখন তাহারা উক্ত স্থানে বিদ্রোহী হিন্দু নরপতিদের মৃতদেহ অযত্নে ফেলিয়া রাখিয়া বন্য পশুপাখীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। মনে হয়, সেই সমস্ত মৃত মানুষের ভাবী বংশধরেরাই আমার সঙ্গে আলাপ আলোচনাক্রমে এই সমস্ত কথা বলিয়া গেলেন।

অতঃপর আসিল ইংরেজ জাতি। মুসলিম সম্প্রদায় তাহাদের ধর্মের গোড়ামী পরিত্যাগ করিয়া ইহুদী নাছারা সম্প্রদায়ের ভাবজগতে নিজদিগকে অভ্যস্ত করিয়া লইতে না পারিয়া তাহাদিগকে কৌশলে এড়াইয়া

চলিতে এবং সুযোগ সুবিধামত বিদ্রোহ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিত না। যাহার পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা সেই ইংরেজ জাতির রোষানলে পড়িয়া সর্বস্ব হারাইয়া ইংরেজ আনুগত্যে পুষ্ট হিন্দু জাতির গোলামে পরিণত হইল। ইতিহাস যাহার সাক্ষ্য বহন করে।

কালের ক্রম বিবর্তনে আবার এই এলাকা হইল বিদ্রোহী মুসলিম জন মানবের মৃতদেহের ভাগাড়ে পরিণত। তাহারা সুচতুর ইংরেজ জাতির প্ররোচনায় হিন্দু জনগণ কর্তৃক নিহত হইয়া এখানে বন্য জানোয়ারের আহার্য-রূপে ব্যবহৃত হইত।

ইসলামী ধর্মমতে, তাহাদের স্বর্গত আত্মা জানাজাবিহীন হওয়াতে নাকি তাহারা শয়তানের আত্মা প্রাপ্ত হইয়াছেন। গভীর রাত্রে আলেয়ার আগুন দেখিয়া দূরবর্তী গ্রামসমূহের অধিবাসীবৃন্দ উহাকেই শয়তান মনে করিত। অনেক অজানা অচেনা পথিক রাত্রিকালে এই স্থান বা বর্তমান গ্রাম অতিক্রমকালে তাহাদের অনেক রকম কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া ভয় পাইয়া দৌড়াইয়া যাইয়া নিকটবর্তী গ্রামের জীর্ণ কুটিরে আশ্রয় লইয়াছেন। গ্রাম বাসীকে তখন জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সমুদয় ঘটনা জানিতে পারিয়া আশ্বস্ত হইয়াছেন। এবং শয়তানের আড্ডাখানা বলিয়া কথিত কেহই উহার ধারে কাছে অবধি যাইতে সাহসী হইত না। জন সমাগমের এইরূপ অপ্রতুলতাহেতু এই অঞ্চল তখন প্রায় ঘন বন বাদাড়ে পরিণত হইয়া যায়।

কালের পরিবর্তনে পরিবেশের পরিবর্তন হয়। বুড়ীগঙ্গার সেই শাখাটি খর স্রোতাবেগে ভাঙ্গিয়া প্রবাহিত হইয়া তিনটি যুগের কলংক এবং বিজয়ের কাহিনী সম্বলিত এই অঞ্চলকে নিজ গর্ভে ধারণ করিয়া আছে। পরবর্তীকালে কয়েক শ বৎসর যেখানে নদীর উত্তাল তরঙ্গ স্রোত প্রবাহিত হইয়া নিঃসীম বালুচরের বুনিয়াদ স্থাপন করিয়া নানা রূপ আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান স্থানীয় লোকজনের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে নুতন এক সম্ভাবনার ক্ষেত খামার; যাহার বক্ষোপরি শোভা পাইতেছে আজিকার এই গ্রাম শয়তানের পাড়া।

খুনি পাড়ার কিংবদন্তী

গ্রামটির নাম খুনিপাড়া। যেখানে জনৈক তরফরাম নামক দুষ্কর্ষ ডাকাত সর্দার তাহার নির্ভীক সাঙ্গ-পাঙ্গ লইয়া ছদ্মবেশে বাস করিত। এবং যাহার আঁচ পাইয়া তৎকালীন মোগল শাসন কর্তৃপক্ষ দক্ষিণে এবং উত্তরে অবস্থিত আড়াই মাইল অন্তর অন্তর দুইটি শক্তিশালী জলঘাঁটি স্থাপন করেন। উহার একটি স্থানের নাম দুবাড়িয়া। যাহা উল্লিখিত খুনিপাড়া গ্রামটিকে মাঝখানে রাখিয়া অতীত দিনের এইরূপ এক জঘণ্য কার্যক্রমের ইতিবৃত্ত তুলিয়া ধরিয়াছে উহার নামকরণের সহিত। তরফরাম ছিল একজন বিখ্যাত খুনী সর্দার। তাহার নেতৃত্বাধীনে আড়াই শত ডাকাত ছিল। আবার এই ডাকাতদের অধিকাংশই ছিল বিদ্রোহী বাঙ্গালী জনতার মুখপাত্র বিশেষ। এবং এখানে ছিল বিশেষ একটি ঘাঁটি। যাহার সন্ধান পাইয়া মোঘল প্রশাসনিক বিভাগ দুইটা ঘাঁটি পাল্টাপাল্টি ভাবে উল্লেখিত গ্রামের দুই পার্শ্বে স্থাপন করতঃ ঘেরাও-এর মধ্যে ফেলিয়া কঠোর হস্তে তাহাদিগকে দমন করার ব্যবস্থা করেন।

সাবধনী তরফরাম সাবধানে টের পাইয়া তখন সাঙ্গপাঙ্গসহ এস্থান পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। শোনা যায় তরফরাম ভাওয়াল গড়ের গহীন অরণ্যের ভিতরে চলিয়া যায়।

বর্তমানের ডাকাতিয়া গ্রামটি নাকি তাহারই নামকরণে ডাকাতিয়া নামে অভিহিত করা হয়। তাহারা এই অঞ্চলে আসিয়া মোঘল জলঘাঁটি গুলি উৎখাত করার যড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া পড়ে। মোগল প্রশাসনিক বিভাগ পরে উহা জানিতে পারিয়া কয়েক সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য তথায় নিয়োগ করেন। দুঃখের বিষয় রাত্রিতে মশার কামড়ে টিকিতে না পারিয়া তরফরাম খুনীকে গ্রেপ্তার করার সমস্ত পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ গন্তব্য স্থলে ফিরিয়া আসে। শোনা যায়, পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণস্বরূপ তরফরাম খুনী সেই ভাওয়াল গড়ের বিজন অরণ্যের মধ্যে হইতেই সুদূর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের তেবারিয়া দু'বাড়িয়া মোগল ঘাঁটিতে আক্রমণ পরিচালনা করে। তরফরাম

খুনী ছদ্মবেশ ধারণ করতঃ তেবাড়িয়া দুর্গের মধ্যে বলে কৌশলে প্রবেশ করিয়া তথাকার সর্দারকে নির্মমভাবে নিহত করে। এবং একখানা চিরকুট লিখিয়া রাখিয়া আসে। যাহাতে লেখা ছিল, এরপরে দুবাড়িয়াতে দেখা হইবে। ভবিষ্যতে সত্য হইল তাহাই। দলপতি নিহত হওয়াতে তৎকালীন সময়কার মোঘল সেনাবাহিনীর মধ্যে এক বিরাট চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। হন্যে হইয়া সকলেই এই ডাকাত দলের অনুসন্ধানে বহির্গত হয়। তরফরাম খুনীর নিকট তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়িল। সেও কিনা তখন হইতে উহার প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া দলের লোকের সাহায্য লইয়া সে পুনরায় খুন লিপ্সায় মাতিয়া উঠে। তাহার এবং তাহার দলের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেওয়া মোঘল সৈন্যদেরকে রীতিমত শায়েস্তা করিবার মানসে সে নিজে এবং দলের বাছাই করা নেতৃস্থানীয় জনা কয় দস্যু সমভিব্যহারে তাহারাও মোঘল সৈন্যদিগকে হত্যা করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। এইভাবে পর পর সাতদিন সাতটি খুনের লাশ গুম করিয়া ফেলিয়া তরফরাম খুনী তখনকার দিনে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করে। অতঃপর সাতদিনের মধ্যেই দুবাড়িয়া বা ধুবড়িয়া ঘাঁটির মোগল দলপতিকে কঠোর প্রহরার মধ্যে দিয়া প্রবেশ করিয়া তাহাকেও এক সময় নিঃশেষ করিয়া ফেলে। খবর যাইয়া পৌঁছিল তখন বাংলার সিপাহসালার ঈশা খাঁর দরবারে। খবর পৌঁছিল দিল্লীর শাহী দরবারে। ক্রুদ্ধ আকবর বাদশাহ্ তাহার প্রধান সেনাপতিকে এতদঞ্চলের দুস্কৃতি পরায়ণ বাঙ্গালীদিগকে কঠোর হস্তে দমনকল্পে পাঠাইলেন। সে সংবাদও ঈশা-খাঁ পূর্বাহ্নেই অবগত হইলেন। এবং আকবর বাদশার সৈন্যদলের মুকাবেলার উদ্দেশ্যে বাংলার সমস্ত দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত দস্যুদের ভাওয়ালের গহীন অরণ্যের মধ্যে একত্র হওয়ার জন্য আহবান জানাইলেন। সকলে একত্র হইয়া ডাকাতিয়া গ্রামে সিদ্ধান্ত লওয়া হইল, সম্মুখ যুদ্ধে আকবর বাদশার সুশিক্ষিত সৈন্যের মুকাবেলা করা আমাদের প্রত্যেকের পক্ষেই অসম্ভব বিধায় অনেক দিন হইলেও আমরা তাহাদের অগ্রগমনে বাঁধা প্রদান করিব না। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অতি সন্তর্পণে মোঘল শিবির সমূহে প্রবেশ করিয়া উহার এক একজন দলপতিকে হত্যা করিব। তাহারা

নিহত হইলেই দলের সকলেই ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে শুরু করিবে। বাঙ্গালী জাতির কাছে তখন মোঘল বাদশার পরাজয় চিরদিনের জন্য ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

যাহা হউক। গুপ্ত হত্যার কলা-কৌশল শিক্ষা দিবার দায়িত্ব তরফরাম খুনীর উপরই ন্যস্ত করা হইল। এ দিকে এই খুনীর নাম-ডাক প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি জনের মুখে হর-হামেশা উচ্চারিত হইতে থাকিল। সকলেই তখন উহাকে তরফরামের খুনী পাড়া নামে অভিহিত করিত।

মানসিংহের পরাজয়ের কথা ইতিহাসে লেখা আছে। তাই সে প্রসঙ্গ এখানে ক্ষান্ত রাখা হইল। মোঘল সেনাপতির এইরূপ আকস্মিক পরাজয় বরণ করাকে কেন্দ্র করিয়া বাংলায় অবস্থিত সমস্ত সেনানায়কদের মধ্যে নিদারুণ হতাশার ভাব দেখা দিল। তাই তাহারা যে যেখানে ছিল, সেখান হইতেই নানা অজুহাতে এদেশ পরিত্যাগ করার মানসে ছুটি ছাটা লইয়া কেহবা পলাইয়া আবার কেহবা দল ত্যাগ করিয়া বাংলাদেশ হইতে বিদায় লইতে শুরু করিল।

মোঘল সেনানায়কেরা বুঝিতে পারিল, এদেশ হইতে অচিরেই তাহাদের চলিয়া যাইতে হইবে। যাহার সুদূর প্রসারী ফলাফল পরবর্তীকালের শাসনামলেই দেখা যাইতে থাকিল।

খুনী তরফরাম আরও বেপরওয়া হইয়া উঠিল। সকলেই বলিত তাহাকে খুনের নেশায় পাইয়াছে। কারণ, এই এলাকায় ছিল তখন নিবিড় ঘন বন। সে উহাতে পলাইয়া থাকিয়া নিরীহ পথচারীদিগকেও পর্যান্ত মোঘলদের চাই হিসাবে হত্যা করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিত। জনমন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। এখন তাহারা কাহার নিকট উহার প্রতিবাদ জানাইবে, তাই উপায়ন্তর না দেখিয়া তরফরামকেই লোকচক্ষুর আড়াল করিয়া ফেলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। ইহাতে স্থানীয় মুসলমান গুণ্ডা-পাণ্ডারাই উদ্যোগ গ্রহণ করে। তাহারা গোপনে কোন এক হত্যাকাণ্ডের পথ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে বাড়ীর বাহিরে ডাকিয়া আনিয়া শাণিত দায়ের একটি মাত্র কোপের আঘাতেইতাহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। ইহার ফলে গ্রামের লোকেরা আপাততঃ নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারার একটা সুযোগ পুনর্বার লাভ করিল।

গোয়ালন্দের কিংবদন্তী

এদেশের মাটিতে যুগে যুগে কত রাজা, মহারাজা, জমিদার, সম্রাট, বাহাদুর তশরিফ আনিয়া এই দেশকে ইতিহাসের পাতায় স্বনাম ধন্য করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যাহার কোন সীমা নাই।

তাহাদের আগমনকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে নগর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্জ, শহর-সুবা, ইত্যাদি পরিষ্কার হইয়াছিল গহীন জঙ্গল, গড়িয়া উঠিয়াছিল লোহার সেতু, তৈয়ার হইয়াছিল বাঁধ, বসিয়াছিল হাট-বাজার, খনন করাইয়াছিল, খাল-পুকুর, প্রচলন করা হইয়াছিল অনেক নতুন বিধি ব্যবস্থার, পরিবর্তিত হইয়াছিল পুরাতন বিধি বিধান সংস্কার হইয়াছিল অন্ধ বিশ্বাসের।

এদেশের মাটিতে আজিও তাহাদের পদধূলি লোকালয়, হাট-বাজার, শহর-নগর-বন্দররূপে কথা কয়, কথা কয় অগণিত মানুষের কণ্ঠের সোচ্চার ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া। যাহা কোনদিনও মুছিবার নয়, বরং ধ্বংসের আগের মূহুর্ত পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবে বলিয়া নির্দ্বিধায় বলা যাইতে পারে।

তাহাদের কেহবা কখনও শিকার করিবার ছলে আসিয়া খেয়াল খুশী মত কোথাও বা তৈয়ার করিয়া গিয়াছেন ডাক-বাংলা কিংবা কোন পান্থশালা। কোথাও বা খনন করিয়া গিয়াছেন পুকুর। স্থাপন করিয়া গিয়াছেন স্কুল মক্তব-মাদ্রাসা। কেহবা ভ্রমণের ছলে আসিয়া তৈয়ার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন মনোরম পুষ্পোদ্যান, কেহবা, মঠ-মন্দির, কেহবা, গীর্জা, মসজিদ। কেহবা, হাট-বাজার, কেহ বা নগর-শহর ইত্যাদি। এই সবের আদি প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সেই সমস্ত স্থানের নামের সহিত নিজের নামকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য উহার নামকরণ করিয়া গিয়াছেন। যেন ভাবী বংশধরেরা যাহার উৎস আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ হইয়া আগামী দিনের ইতিহাসে তাহাদের নাম লিখিয়া লইতে পারে তাহার এক বিপুল আয়োজন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সামনে—সরল, সঠিক এবং পাকাপোক্ত এক সত্য সুন্দর আদর্শ হিসাবে।

এইরূপ এক একটি স্থান বা নামের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা সত্যই দেখিতে পাই যে, উহার পিছনে এক রহস্যময় ঘটনার যাদুজাল বোনা রহিয়াছে। যাহার সূত্র ধরিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইলে আমরা আরও দেখিতে পাইব, উহা কোন রাজা বাদশা বা জমিদার সুবাদারের নেহায়েত কোন কার্য্য ক্রমকেই কেন্দ্র করিয়া এই সমস্ত শহর বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভাবী বংশধর হিসাবে আমরা কেবল উহার নামকরণকেই বহিঃদৃষ্টির বেড়াজালে আবদ্ধ রাখিতেই তৃপ্তি বোধ করি। কখনও জানিতে চাই না উহার মূল উৎস কোথায় বা কিরূপ। আজিকে সেই দিন আসিয়াছে। আজিকে সেই সময় আসিয়াছে। সময় আসিয়াছে সেই সমস্ত বিষয়বস্তুর উৎস আবিষ্কার করিয়া, উহা হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া, নিজেদের জীবন তথা গোটা সমাজ ব্যবস্থার বিধি-বিধানের সহিত উহার কিছুটা রঙ লাগানোর এবং যাহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে আমাদের সুখী সুন্দর জীবন যাপনের মূল চাবিকাঠি ।

আমাদের জাতীয় জীবনে ইহার চাইতে শরম পাওয়ার আর কিছু আছে কিনা উহা আমার জানা নাই। স্বাধীন জাতি হিসাবে গর্ববোধ করিতে হইলে আজ আমাদের পক্ষে এই সমস্ত স্থানের নাম শহর-বন্দরের বুনিয়াদ স্থাপনের ইতিহাসের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইতে হইবে। যে ইতিহাসকে সম্বল করিয়া এককালে বাঙ্গালী জাতি তাহার জাতীয়তা-বাদের দৃঢ় শ্লোগান তুলিয়া এমনকি শাহানশাহ্ আকবর বাদশার সিংহাসন পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল। জাতি হিসাবে আমরা আজিকে কিসের বড়াই করিতে সাহসী হইব—কি আছে আমাদের তেমন বড়াই করিবার মত সম্বলটুক।

সূক্ষ্ম চেতনাসম্পন্ন মানুষের দরকার। যথেষ্ট পরিণামদর্শী এবং বিবেকবান মানুষের নেহায়েত প্রয়োজন আজ, যাহারা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতে সমর্থ হইবেন বাঙ্গালীত্বের আসল সত্বা কোথায় ?

আমরা আজ যাহার আলোচনা করিব, যাহার অতীত ইতিহাস ঘাঁটিলে দেখিতে পাইব উল্লিখিত বিষয়ের কোন না কোন একটা ঘটনা

উহার পশ্চাৎদেশ অলংকৃত করিয়া রহিয়াছে। আর যে ঘটনা কিংবদন্তীতে রূপ লাভ করিয়া তখন হইতেই অদ্যাবধি লোকমুখে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যাহা শ্রবণে আমরা সত্যি কত সুখ এবং গৌরব বোধ করি।

এরূপ গৌরব বোধ করার পিছনে কোনই বাহাদুরী নাই। যদি না আমরা উহা হইতে সমুচিত শিক্ষা লাভ করি। স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে উহার অপরিসীম গুরুত্ব রহিয়াছে এবং যে গুরুত্বকে কাজে লাগাইয়া আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ সুখ এবং শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের বিধি ব্যবস্থা নির্ধারণে প্রয়াস পাইতে পারি।

এদেশ এখন স্বাধীন। স্বাধীন নাগরিক হিসাবে নিজেদিগকে পরিচয় করিতে হইলে, বিশ্বের দরবারে নিজ দেশের সাহিত্য সংস্কৃতি এবং ভাস্কর্য্য পুরাকীত্তির নীতিমালা লিপিবদ্ধাকারে তুলিয়া ধরিতে হইলে সমুদয় ঘটনা জানিয়া শুনিয়া উহার সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া পরে উহার সার্থকতা বাস্তবজীবনে প্রতিফলিত করিয়া লইবার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে, অবশ্য নিজেদিগকে স্বাধীন জাতি হিসাবে পরিচিত করিতে আর বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না।

আজ আমরা যাহাকে ছোট একটা স্থান বা ঘটনা বা বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিতেছি অথবা অনুমান করিতেছি উহাই হয়তো বা এককালে গোটা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে পরম গৌরবের বস্তু ছিল। যাহার নামের সহিত, যাহার কাজের সহিত পরিচিত হইতে সকলেই আগ্রাহ্নিত থাকিত।

তাই সেইরূপ, সেকালের গড়া কোন দালান—ইমারতের প্রস্তর খণ্ড হাতে লইয়া গভীর অনুভূতির সঙ্গে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, আগেকার দিনে যে বাঙ্গালী মানুষটি উহা নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন ভবিষ্যৎ বাঙ্গালীর জন্য সে উহা হইতে কিরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছে? যোগ বিয়োগ করিলে দেখা যাইবে, কিছুই না। শিক্ষা লাভের মধ্যে এইটুকু শিক্ষালাভ হইয়াছে মাত্র, আভিজাত্য প্রকাশ করিয়া কথা বলা আর পথ চলা। কার্য্যতঃ কোন শিক্ষাই সে বাঙ্গালী আহরণ করিতে পারে নাই। এই একটি মাত্র উদাহরণ উল্লেখ করিয়াই আমি পাঠকের খেদমতে তুলিয়া ধরিবার প্রয়াস পাইলাম। অতীতের বাঙ্গালী জাতির সুষ্ঠ কর্মময় জীবন ধারার বিচিত্র বিন্যাসবলী।

রাজা-বাদশা, জমিদার-সুবাদার কোথাও কোন উদ্দেশ্যে গমনা-গমন করিলে তাহাদের সম্বর্দ্ধনার উদ্দেশ্যে স্থানীয় কর্মচারীদের সহযোগিতায় গ্রাম্য জনসাধারণ ঘটা করিয়া যে সমস্ত নির্ভেজাল সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করিত, যে সমস্ত উপঢৌকনাদি পেশ করিত, যাহা পরবর্তী কোন রাজা-বাদশাগণ চোখেও দেখিতে পান না।

তাহাদের আগমনের সুদূর প্রসারী ফলাফল আজ আমরা কেবল ঐ সমস্ত স্থান, নগর-বন্দর-শহর, হাট-বাজার, ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধভাবে দেখিতে পাই। অথচ দেখাইবার জন্য প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ গ্রহণ করিনা যে কেন, কি উদ্দেশ্যে, তাহারা এতদ্ এলাকায় আসিয়া আবার চলিয়া গেলেন। দেখিতে পাই শুধু তাহাদের আগমন উপলক্ষকে কেন্দ্র করিয়া যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাই।

আমাদের দূরদৃষ্টির অভাব। চেতনা শক্তির আশু লোপ প্রাপ্তিই যে উহার মূলতঃ কারণ আমরা উহা স্বীকার করি না। যতদিন নিজেদিগকে আমরা অনেক বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি। এই জাতীয় জীবনে সেই দীনতা দূর করিতে হইলে পূর্বাপর সম্পর্ক বজায় রাখিয়া দৃঢ় পদক্ষেপের সঙ্গে অগ্রসর হইতে হইবে। যাহার ফলে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনে উহার প্রতিটি কার্যাক্রমকে সু দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে আমরা সক্ষম হইব।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল। বাংলার সুবেদার তৈরী করিলেন তৎ-কালীন সময়কার সুরম্য নগরী এই ঢাকা, যাহার পাদদেশ ধৌত করিয়া বহিয়া চলিয়াছে বুড়ীগঙ্গা নদী। যাহার তিনদিকে পরিবেষ্টিত সবুজ বন-রাজির শ্যামল ছায়া বাংলার শ্যামল অঙ্গে যেন রূপোর হার উহার শোভা বর্ধন করিতেছে। যাহার সুন্দর অথচ নিখুঁত প্রতিচ্ছবি বুড়ীগঙ্গার স্বচ্ছ পানির ঢেউ এর শিখরে খান খান করিয়া হাঁসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। অসংখ্য জল কুমুদ যেন উহাকে ধরিবার আগ্রহে হাসিমুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঢেউ এর দোলায় দোদুল্যমান বাহুলতিকা যেন উহাদের আগলাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। পিক-পাপিয়া মাঝে মধ্যে জল দামে নাচিয়া উঠিয়া কোথাও বা ডুব দিয়া যেন উহার আসল রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রভাতে প্রাকৃতিক শোভা উহার আরও বর্ণনাতীত সুন্দর এবং আভিজাত্যময় অজস্র ফুলের সৌরভে এই ঢাকা নগরীর সুন্দর জীবন আরও সুন্দর হইয়াছে। পাখীদের কুজনে ফুলের সৌরভে দিক-দিগন্ত মুখরিত। প্রাতঃ-কালের স্নিগ্ধ আলো বাতাস তৎকালীন সময়কার রাজা বাদশাহদের সুন্দর নির্মল জীবনের এক মহান প্রতিচ্ছবি লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সু-বিশাল ঢাকা নগরী। সুবেদার ইসলাম খাঁর আনন্দ আর দেখে কে? খুশীর অতিশয্যে অধীর হইয়া তিনি দিল্লীর সম্রাট বাদশা জাহাঙ্গীরকে জানাইলেন এক বিশেষ আমন্ত্রণ। আমন্ত্রণ গৃহীত হইল। তিনি সম্রাজ্ঞী নুরজাহান সমভিব্যাহারে সুদূর বাংলাদেশের মত এক ঘন-বন, নদ-নদী বহুল এলাকায় নব নির্মিত এই শহরে তশরিফ আনিবেন। বিদ্যুৎ বেগে এ সংবাদ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সম্রাটের আগমনের একমাস পূর্ব হইতেই ঢাকা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড অবধি যে সামান্য যোগাযোগের রাস্তা ছিল উহা পুনঃ সংস্কারের ব্যবস্থা করা হইল। হাজার হাজার বাঙ্গালী শ্রমিক কুলি তখন দিন-রাত্রি শ্রম দিয়া উচু নীচু স্থানসমূহ কাটিয়া চিরিয়া ভরাট করিয়া অসংখ্য বন-বাদাড় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া এক বিরাট রাস্তা তৈরী করার ব্যবস্থা করিল। যে রাস্তাটির বক্ষোপরি আজ আমরা মটর বাস পরিচালনা করিয়া মিরপুর-সাভার-নয়ার হাট হইয়া শিবালয় আরিচা পর্য্যন্ত পৌঁছাই। উহার আদি বুনিয়াদ তখনকার দিনে এই সম্রাটের আগমন উপলক্ষকে কেন্দ্র করিয়াই তৈরি হইয়াছিল। এই সময় যমুনা নদী আরও অধিকতর বিস্তৃত ছিল। যাহার পশ্চিম পার্শ্বে ছিল ঘন হিন্দু বসতি এবং যাহাদের অধিকাংশ লোকই ছিল হিন্দু ঘোষ সম্প্রদায়ের। যাহাদের হাতের তৈরী বিশুদ্ধ মিষ্টান্ন দিল্লীর শাহী দরবার পর্য্যন্ত সসম্মানে গৃহীত হইত। দিল্লীর রাজ দরবারে এই ঘোষদের বা গোয়ালাদের ছিল বেশ একটা সুনাম। কারণ, তাহারা খাঁটি বাঙ্গালী হিসাবে বাংলার ঐতিহ্য মণ্ডিত খাঁটি জিনিষ তৈরি করিয়া তথায় প্রেরণ করিত।

সেই ঘোষ বা গোয়ালারাও পর্য্যন্ত জানিতে পারিল যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর ঢাকা নগরী দেখিবার উদ্দেশ্য আগমন করিতেছেন। তখন তাহাদের খুশী দেখে কে! জীবনের সমস্তটুকু শ্রম দিয়া তাহারা মূল্যবান মিষ্টি সামগ্রী প্রস্তত

করিতে শুরু করিল। দিল্লীর শাহী দরবার হইতে তাহাদের জন্য শুধু বাহবাই আসিত। কিন্তু এখন আসিতেছে খোদ বাহবা দেওয়ার মালিক। তাই তাহাদের সুখের সীমা নাই। তখন এই এলাকার নাম ছিল গোয়াল-পাড়া। তাই এই গোয়ালপাড়া হইতে সম্রাট শেরশাহ কর্তৃক নির্মিত গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড অবধি নাকি হালাইখানা সাজানোর আন্জাম তাহারা করিল। বিভিন্ন রঙের চিত্রে চিত্রিত বিভিন্ন মিষ্টি দ্রব্যের ভাণ্ডার খুলিয়া বসিল গোয়ালা সম্প্রদায়। তাহাদের উদ্দেশ্য, সম্রাট যেন বুঝিতে পারে, এ দেশের প্রতিটি মানুষের হৃদয় এমন মিষ্টি মধুর অথচ বিচিত্র বর্ণের এবং বিচিত্র রঙের শিল্প স্বভাবসম্পন্ন।

এদেশে তখন অভাব কাহাকে বলে, লোকে তাহা জানিত না। সুখের দিনে সুখের এই সংবাদটি যে বাঙ্গালী জীবনে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগা-ইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। আর যে সুখবরটি বাঙ্গলার মানুষ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল তখনকার দিনে, যাহা ভাবিলে আজিকার দিনে বিশ্বাস করা মুশকিল হইয়া পড়িবে।

যমুনা নদীর পশ্চিম কাছাড় হইতে শুরু করিয়া গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড অবধি নতুন করিয়া এক সড়ক তৈরি করা হইল। যে সড়কটি আজ আবাদী জমিনে পরিণত হইয়া গিয়াছে। যাহার বক্ষোপরি গড়িয়া উঠিয়াছে অনেক বসতি, গ্রাম, হাট-বাজার। যাহার বক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে ছোট ছোট নদী-নালা-খাল-বিল। ব্রিটিশ সরকার কয়েকবার উহা পুনঃ সংস্কারের পরি-কল্পনা লইয়াও তাহা বাস্তবায়িত করিতে পারেন নাই।

যাহা হউক, সম্রাটের আগমনের দিনটি ক্রমাগত আগাইয়া আসিতে থাকিল। আর গোয়ালাদের আনন্দের সীমা বাড়িয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে সেই শুভ দিনটি আসিয়া হাজির হইল। হাজির হইল বাংলার জন্য বিরাট এক শুভাশীষ দিল্লীর সম্রাটের। হাজার হাজার পাইক পেয়াদা, বরকন্দাজ—লাঠিয়াল সর্দারেরা সকাল হইতে লাইনের দুই পার্শ্বে সারিবদ্ধাবস্থায় দণ্ডায়মান হইল। ঢাকা শিবালয় অবধি লাইনের দুই পার্শ্বে দিয়া বাঙ্গালী সৈনিকেরা সম্রাটকে বীরোচিত সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে অস্ত্র-শস্ত্রে সু-সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। সেদিন তাহারা তাহাদের স্ব-স্ব

স্থান লইয়া এমনিভাবে দাঁড়াইয়াছিল যে, পাহাড় ভাঙ্গিয়া তাহাদের মাথার উপর পড়িলেও তাহারা চুল পর্যন্ত নড়িত চড়িত না তাহাদের স্থান হইতে। সুবেদার ইসলাম খাঁ ঘোড়া ছুটাইয়া সর্বদা তাহাদের স্থান লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিলেন। নদী পারাপারের জন্য তখন এক হাজার একশত একটি বাইচের খেল্লা নৌকা লম্বালম্বিভাবে এমন করিয়া বাঁধা হইয়াছিল যে উহার উপরিভাগে বাঁশের মাচান, তাহার উপরিভাগে তালাই, তাহার উপরিভাগে এক হাত পুরু করিয়া মাটি, তাহার উপরিভাগে পাট নির্মিত ছালা অতঃপর মাদুর এবং সর্বোপরি বাঙ্গালী কুটিরজাত শিল্পাঙ্কিত ফরাস যে যাহার উপর দিয়া সম্রাটের হস্তীযুগল আরামের সহিত পদচারণা করিয়া ঢাকার দিকে অতি অনায়াসেই অগ্রসর হইতে পারিত।

গোয়ালপাড়া হইতে গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড অবধি ঐ একই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। পথের দুই পার্শ্বে বাঙ্গালী সৈনিকেরা বীরোচিতভাবে অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। নকীবেরা নেপথ্য হইতে হাঁকিতে লাগিল। বন্দীরা বন্দনা গাহিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। বৈকাল তিন ঘটিকার সময় সম্রাজ্ঞী সমভিব্যাহারে সম্রাট জাহাঙ্গীর অসংখ্য সৈন্য-সামন্ত পরিবেষ্টিত হইয়া গোয়ালাদের বসতি এলাকার নিকটে আসিয়া পেঁৗছিল।

সাদর সম্বর্ধনা জানাইবার জন্য ইসলাম খা পুর্ব হইতেই গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড পর্যন্ত আগাইয়াছিলেন দিনের পূর্বাহ্নেই। তিনি সম্রাটকে অশ্ব পৃষ্ঠে চড়িয়া পথ দেখাইয়া আগাইয়া লইয়া চলিলেন।

গোয়ালপাড়া অবধি পৌছিলেই গোয়ালন্দের সম্বর্ধনার সেকি মহোৎসব শুরু হইয়া গেলো যে, যাহা অবলোকন করিয়া সম্রাজ্ঞী নুরজাহান সম্রাটকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উহারা অমন করিতেছে কেন? সম্রাট তাহার প্রতি জবাবে বলিয়াছিলেন, হরওয়াসত খোশ্ আমদেদ জারী কিয়া। সুবেদার ইসলাম খা বলিলেন, আপনাদের শুভাগমন উপলক্ষে তাহাদের ঐরূপ আনন্দ গীতি উৎসব শুরু হইয়াছে। তিনি জানিতে চাহিলেন, উহারা কারা? সুবেদার প্রতি জওয়াবে যখন বলিলেন, উহারা গোয়ালা বা ঘোষ, যাহারা দুগ্ধ হইতে ঘি, মাখন, ইত্যাদি মিষ্টান্ন তৈরি করিয়া থাকেন। যাহাদের হাতের মিষ্টির যশ-গৌরব দিল্লীর শাহী মহলে পর্যন্ত যাইয়া কীর্তিত হইয়াছে। তাই আপনাদের

শুভ পদার্পণে ঐরূপ আনন্দগীতি করিতে করিতে বিভিন্ন মিষ্টির ব্যাখ্যা করিতেছে। তখন সম্রাট বলিলেন, উহা তবে সেই গোয়ালন্দের আনন্দ? সুবেদার বলিলেন, জী হ্যাঁ। তাহাদের বেষ্টনী ভেদ করিয়া যখন সম্রাট তৎকালীন সময়কার যমুনা নদীর পাড় পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন তখন দেখিলেন, উহার মধ্যস্থিত পানির ঘূর্ণিপাক এবং উজান ভাটির এক অপূর্ব সমাবেশ। উহা অবলোকন করিয়া সম্রাট বলিলেন, সুবেদার, এদেশের মানুষ নিশ্চয়ই এমনি অবস্থার লোক। যাহাদের মগজে সর্বদা ঐরূপ বিবেকের প্যাঁচ বর্তমান। যাও, আর যাওয়া হইবেনা আমার। এদেশের জাহাঙ্গীর নগর বা তোমার তৈরি ঢাকা দেখিতে যাওয়া সম্ভব হইবে না। সম্ভব হইবে না এদেশের মানুষের মন জয় করা। এদেশের মানুষ ঐরূপ প্যাঁচ বিশিষ্ট মনের অধিকারী, তাই আমার যাত্রা এখানেই স্থগিত। হস্তী চালক সৈনসামন্তগণকে তিনি প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিলেন পুনরায় দিল্লীর দিকে।

পার্শ্বচর, অনুচর, সভাসদ, পরিষদ ইত্যাদি অমাত্যবর্গ তখন তাঁহার সহিত দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতে শুরু করিলেন। কিছুক্ষণের জন্য তিনি দাঁড়াইয়া গোয়ালাদের আমোদ উপভোগ করিলেন এবং উহার সহিত উপভোগ করিলেন শ্যামল শ্রী সম্পন্ন বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ রূপ-রস। স্নিগ্ধ আলো বাতাস, স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের উৎসব।

গোয়ালই আনন্দ যাহার প্রকৃত অর্থ দাঁড়ায় গোয়ালদের আনন্দ। সুবেদার ইসলাম খাঁকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিয়া সম্রাট কেবল মুখে উচ্চারণ করিলেন, "জিতে রহো গোয়াল-ই-আনন্দ।" তাহার হস্তীযুগল ও দিল্লী হইতে আগত সমস্ত সৈন্য-সামন্ত এবং আমত্যবর্গ ফিরিয়া চলিল।

সেই হইতে উহার নামকরণ হয় গোয়াল আনন্দ বা গোয়ালন্দ। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসনামলের মানচিত্রে উহাকে গোয়ালন্দ হিসাবেই ধরিয়া লইয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। সুবেদার ইসলাম খাঁ ফিরিয়া আসিলেন। সমগ্র ব্যাগ্র জনতা বিফল মনোরথ হইয়া যমুনার পূর্ব তীর হইতে ঢাকাভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন। ঘটা করিয়া যে সমস্ত আয়োজন করা হইয়াছিল তাহার বরাদ্দ বাবদ তখনকার দিনেই নাকি ৭ কোটি টাকা খরচ করা হইয়াছিল।

সিলেট

সিলেট জেলা থেকে এই একটি মাত্র কিংবদন্তী সংগ্রহ করেছেন
বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব চৌধুরী
গোলাম আকবর সাহিত্যভূষণ। তাঁর ঠিকানা—
গ্রাম: দুর্গাপুর, ডাকঘর: বৃন্দাবনপুর,
জেলা: সিলেট।

উসমান দিঘী

দিল্লীর সম্রাট জাহাংগীর (জাংগীর বাদশা) শাহের আমলে বাংলার পাঠানবীর খাজা উসমান খাঁ লোহানী বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয় ছিলেন। খাজা উসমানকে দমন করিবার জন্য সুবাদার ইসলাম খাঁ (দ্বিতীয় বার) বিশেষ ভাবে আদিষ্ট হইয়া বাংলায় আসেন।

খাজা উসমান মোমেনশাহীর বোকাইনগরে যুদ্ধ করিয়া বারবার পরাজিত হন ও পিছু হটিতে হটিতে সিলেটে গিয়া পেঁীছেন। সিলেটে গিয়ে তিনি মৌলবী বাজার মহকুমার রাজনগর রাজ্যের রাজা স্ববিদ নারায়ণকে সবংশে নিধন করেন। এরপর উক্ত রাজ্য দখল করিয়া সামন্ত রাজধানী শ্রীসূর্য মৌজার পূর্বপ্রান্তে অস্থায়ী রাজধানী স্থাপন করেন।

যেখানে তাহার অস্থায়ী ক্যাম্প ছিল সেখানে একটি দিঘী কাটাইয়া পানির সুবিধা করিয়াছিলেন। এ দিঘীর নাম "উসমান দিঘী"। দিঘীর ভূ-পরিমাণ "দুই একর" হইবে। দিঘী দৈর্ঘ্য প্রস্থে সমান। এতদিন পরেও দিঘীর বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। দিঘীর পাড়গুলি এখনও সুউচ্চ। দিঘীতে কোনরূপ জলীয় উদ্ভিদ জন্মে না। ঘনকৃষ্ণবর্ণ জল সূর্য্যা-লোকে চিক্ চিক্ করিয়া দর্শকের মনে ভীতির সঞ্চার করে। দিঘীটি সমভাবে গভীর নহে। চারিদিক হইতে ধাপে ধাপে গভীর হইতে গভীরতার দিকে গিয়াছে।

এইরূপ খনন করাকে "হরইকাটা" বলে। অন্যান্য দিঘীর মত এই দিঘীতেও গুপ্তধনের "কিংবদন্তী" (যেমন, থাল-লোটা, বাসন ইত্যাদি তৈজসাদি) আছে। "খওয়াজা"র বাত্তি দিলে প্রয়োজন অনুযায়ী তৈজসাদি পাওয়া যাইত। একদা কে বা কাহারা তাহা হইতে একটি রাখিয়া দেয়। এরপর হইতে আর বাসন পাওয়া যায় না।

পতন উষার নিবাসী আব্দুর রহমান চৌধুরী বলেন

তাহার বয়স ৭২ বছর) তিনি ছোট বেলা তাহার পিতামহ মাংছবদর মিয়াজী হইতে শুনিয়াছেন, ঐ দিঘীর উত্তর ও পূর্বপাড়ের সম্মিলিত স্থানে অর্থাৎ ঈশান-কোনে মাটির নীচে গুপ্ত ধনাগার ছিল। ঐ স্থানটি এখনও উঁচু ঢিবির মত। খনন করিয়া দেখিলে সত্যাসত্য পরখ হইয়া যায়।

মানুমাটীর পুকুইর

"উসমান দিঘী" হইতে ৩ ফার্লং উত্তর পশ্চিমে "মানুমাটীর পুকুইর" নামে এক পুষ্করিনীর অস্তিত্ব আছে। নামটা শুনিতেই মনে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে যে

ইসলাম
ও
খৃষ্টান

সম্প্রদায়ের লোক মরিলে এই পুকুর পাড়ে "মাটি দেওয়া" (গোর দেওয়া) হয়। এই পুকুরের পূর্ব পাড়েও গোরস্থান আছে। এরূপভাবে দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ স্থানে দিঘীর পাড়ে গোরস্থান আছে কিন্তু কোন পুকুরেরইতো এরূপ নামকরণ নহে।

পুকুরটির উত্তর ও পূর্বপাড় আছে। পূর্বপাড়ে কয়েকটি বৃক্ষ এবং বাঁশের ঝাড় আছে। জলাংশ ভরাট হইয়া ধানী জমিতে পরিণত হইয়াছে। পাড়সহ ভু-পরিমাণ এক একরের বেশী হইবে না।

কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, মোগলের সহিত যুদ্ধে যখন পরাজয় নিশ্চিত মনে করিলেন, খাজা উসমান খাঁ তখন বিজিত শত্রুর হাতে নিজ পরিবার পরিজনের দূর্দশা, লাঞ্ছনা কল্পনা করিয়া নিজ হাতে স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিজন সকলকে হত্যা করিয়া এই পুকুরের পাড়ে পুঁতিয়া রাখেন। এবং "বৃন্দাবনপুর হইয়া দমদমা" নামক স্থানে যুদ্ধে গমন করিয়া তিনি পরাজিত ও নিহত হন। তদবধি ঐ পুকইরটি ঐ নামে ঐ লোমহর্ষক কাণ্ডের স্মৃতি বহন করিতেছে।

দিল্লী বাত্তির ঢিপি

মোগলের সহিত খাজা উসমান খার যুদ্ধের সময় তাহার "ছাউনি"র আওতাধীন,

শ্রী সূর্য্য—পতন উষার

রূপষপুর—রামেশ্বরপুর

বল রামপুর—দুর্গাপুর

বৃন্দাবনপুর—গোপীনগর

প্রভৃতি মৌজায় গোলাকার উঁচু উঁচু মাটির "ঢিপি" (স্তুপ) দৃষ্ট হয়। স্থানীয় জনসাধারণ ঐ সব ঢিপিকে দিল্লী বাত্তির ঢিপি বলে। কারণ অনু-সন্ধানে জানা যায় ঐ সব উঁচু ঢিপির উপর বসিয়া রাত্রিকালে "দিল্লীর বাত্তি" অর্থাৎ মোগল ছাউনীর আনাগোনা নিরীক্ষণ করিতেন। দিল্লীতে তখন জাহাংগীর বাদশাহের হুকুমত। এজন্য মোগল ছাউনীর আলোক রশ্মিকে দিল্লী বাত্তি" বলা হইত।

উস্‌মান গড়

শ্রীসূর্য্য মৌজায় পূর্বদিকে উঁচু মাটির গড় বিদ্যমান আছে। গড়ের উপরে বর্তমানে জনবসতি আছে। এই জনবসতির নাম "উসমান গড়" বা "টিলা গড়"। এই গড়ের উচ্চতা এখনও ১৫ ফিট এর চাইতেও অধিক। দৈর্ঘ্য এক মাইলের মত। প্রস্থ পোয়া মাইলের মত হইবে।

সোনার দিঘী

সিলহট জেলার, মৌলবী বাজার মহকুমার কমলগঞ্জ থানার ১নং রহিমপুর ইউনিয়নের ছয়কুট মৌজায় (জেলা বোর্ডের মৌলবী বাজার সমসের নগর রাস্তার পাঁচ মাইলের খুঁটির এর আধাফার্লং পশ্চিমে) এই দিঘী অবস্থিত। দিঘীর পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ে পুরানা বট বৃক্ষ আছে। দক্ষিণ পাড়ের চিহ্ন আছে। উত্তর পাড় নাই। দিঘী ভরাট হইয়া ধানী জমিতে পরিণত হইয়াছে। ঠিক মধ্যস্থলের জমিখণ্ড কিছুটা নীচু।

ভু-পরিমাণ ৬ একর এর কম হইবে না। দিঘীটির বয়স ৪০০/৫০০ বছরের কম হইবে না। ছয়কুট নিবাসী ৮০ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ বসন্ত কুমার দত্ত মহাশয় বলেন, তাঁহার পিতামহ শুনিয়াছিলেন তাহারাও (পিতামহ) নাকি দিঘীর এই অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ১২৬০ বাংলায় পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৩৭০—১২৬০=১১০ বছর আগেই যখন দিঘীর এই অবস্থা ছিল তখন দিঘীটির স্মরণাতীতকালের পর্য্যায়ভুক্ত তালুক বন্দোবস্তের সময় (১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে) অন্যান্য ভূমিসহ এই দিঘী "সানন্দ স্তপ" তালুকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া জরিপ হইয়াছে।

দিঘীর নামকরণ সম্পর্কে দত্ত মহাশয়ের পিতামহ নাকি বলিয়াছিলেন যে, ঐ দিঘীতে

সোনার নাও
সোনার বৈঠা
সোনার সিন্ধুক
সোনার থাল বাসন

এমন কি মাছগুলিও সোনার বর্ণ ছিল বলিয়া লোকে উহাকে "সোনার দিঘী" নামে অভিহিত করিয়াছিল। কিন্তু স্মরণ-কালের মধ্যে এই দিঘীতে কেহ এরূপ কোন কিছু দেখে নাই।

"সোনার দিঘী" যে সময়ে খনন করা হইয়াছিল ঐ সময়ে সোনার দিঘীর

দক্ষিণাঞ্চলে মাইল খানেক ব্যাপিয়া একটা উন্নত পল্লী ছিল বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়-মান হয়। কেননা "সোনার দিঘীর" দক্ষিণ দিকে

(১) দয়াল বিন্দুর দিঘী

(২) উথাল পুকুর

(৩) মথলর দিঘী

উত্তর দিকে

(৪) তেরাউলি পুকুর

নামে পরিচিত আরও চারটি দিঘী আছে।

দিঘীগুলির নামকরণে বুঝা যায়, ঐ সময় দিঘী খননকারী লোকেরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ঐ সময়ে বোধ হয় "পাক" করানোর কোন বিধান ছিল না। কোনটিতেই "ইট" বা "শোন" দ্বারা বাঁধানো কোন ঘাটের বা বাড়ী ঘরের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না বা ছিল বলিয়া কোন জনশ্রুতি নাই।

পরিশিষ্ট

যাঁদের কাছ থেকে কিংবদন্তীগুলো সংগৃহীত হয়েছে বিষয়বস্তুসহ তাঁদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

ক্রমিক নং	নাম	কিংবদন্তীর নাম	ঠিকানা
১।	কবির আহমেদ	নাডের দীঘি	গ্রা—সিঙ্গাপুর, পো—ঝলম, জেলা কুমিল্লা
২।	মুজিবর রহমান	ছাআলী খোন্দকার	গ্রা—নোয়াপাড়া. ডাক—নোয়াপাড়া, জেলা—চটগ্রাম
৩।	ডাঃ মোঃ মুসলিম	কুড়া কাডা মসজিদের পুরাতত্ব	গ্রা—হরিণঘাইন, পো—বুধপাড়া জেলা—চটগ্রাম
৪।	শ্রী উপেন্দ্র সাধু	কান্দরের ধুচুনী	গ্রাম—পয়লা, থানা—খিওর, জেলা—ঢাকা
৫।	অহেদালী বেপারী	গাছকান্দার চকের আলোক লতা	গ্রা—হিজুলিয়া, পো—ঘিওর ঢাকা
৬।	খৈনুদালী মোল্লা	ত্যাউতার পাক	গ্রা—যমদুয়ারা, থানা—শিবালয় ঢাকা
৭।	শ্রী উপেন্দ্র সাধু	নীলকুঠির আউলিয়া ও নাক্কু মুন্সী	গ্রা—পয়লা, থানা—ঘিওর, ঢাকা
৮।	আবেদ ভূইয়া	পেত্নী-তলা	গ্রা—ঘোকশাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা
৯।	শ্রী উপেন্দ্র সাধু	বিন্দু সওদাগরের কিংবদন্তী	গ্রা—পয়লা, থানা—ঘিওর, ঢাকা

১০।	শ্রী উপেন্দ্র সাধু	বানিয়া জুড়ির তমাল পুকুর	গ্রা—.য়লা, থানা—ঘিওর, ঢাকা
১১।	কছিম উদ্দিন	বজরার চকের পেতনা পেতনী	গ্রা—বইন্না, পো—খলসী, ঢাকা
১২।	শ্রী জগদীশ চন্দ্র পাল	বহরার মওলার সোনার নৌকা পবনের বৈঠ্যা	গ্রা—মানদারতা থানা—দৌলতপুর ঢাকা।
১৩।	কছিমউদ্দিন মাতব্বর	বৈন্যার বিলের দাগুাল	গ্রা—বইন্যা, পো—দৌলতপুর ঢাকা
১৪।	শ্রী জগদীশ চন্দ্র পাল	মালাদির চরের কলেরার ছুল	গ্রা—মানদারতা, পো-চক মিরপুর, ঢাকা
১৫।	শ্রী জগদীশ চন্দ্র পাল	মান্দার তার বট গাছের চাইর ভদ্দ লোক	গ্রা—মান্দারতার, পো—চক মিরপুর ঢাকা।
১৬।	কছিম উদ্দিন মাতব্বর	শিয়াল ডাঙ্গার বিড়াল	গ্রা—বইন্যা, থানা—দৌলতপুর, ঢাকা
১৭।	মোঃ নায়েব আলী	স্যাওড়া গাছের চাচি	গ্রা—বড় পয়লা, পো—তেরশ্রী, ঢাকা
১৮।	শ্রী রাজেন্দ্র লাল রাজবংশী	কাসিম ডাঙ্গা	গ্রা—ধামশর, পো—বাঙ্গলা, ঢাকা
১৯।	মইন উদ্দীন	বৌদ্ধের হস্তী	গ্রা—শ্রীধরগঞ্জ, পো—ঘিওর, ঢাকা
২০।	আছালত মাতব্বর	মাচানের মিয়াবাড়ী	গ্রা—সাকরাইল, পো—সাকরাইল, ঢাকা।
২১।	আফাজ সরকার	গুরমার মেলা	গ্রাম ও ডাক—নিমগাছ, পাবনা
২২।	আব্দুর রহমান	শয়তানের পাড়া	গ্রাম—শয়তানের পাড়া, পো—টোলবাইলা, ঢাকা।

২৩।	মতলুবর রহমান	খুনিপাড়া	গ্রা—খুনিপাড়া, পো—সালিমাবাদ পাবনা।
২৪।	হাসমত আলী মিঞা	গোয়ালন্দ	গ্রা—রাজবাড়ী, পো—রাজবাড়ী, ফরিদপুর
২৫।	আবুল কাসেম	উসমান দিঘী	গ্রা—মরিচা, পো—পতন উষর, সিলেট।
২৬।	আবুল কাসেম	উসমান দিঘী	গ্রা—মরিচা, পো—পতনউষর, সিলেট।
২৭।	আবুল কাসেম	উসমান দিঘী	গ্রা—মরিচা, পো—পতনউষর, সিলেট
২৮।	আবুল কাসেম	উসমান দিঘী	গ্রা—মরিচা, পো—পতনউষর, সিলেট।